বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ঃ মুক্তিযুদ্ধে রৌমারী

অজয় রায়

রৌমারী মুক্তাঞ্চল আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। অথচ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রৌমারী রণাঙ্গন ছিল একটি অনন্য নাম, ছিল আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এবং আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম তাদের কাছে একটি অবিস্মরণীয় নাম। ৭১' এর সেই রক্তঝরা দিনগুলিতে রৌমারী মূল চড়, রাজীবপুর চড় এবং ব্রহ্মপুত্রের বুকে ছোট বড় অসংখ্য চড় ও দ্বীপমালা নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেদিন যুদ্ধাবস্থা বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ও বিশাল মুক্তাঞ্চল। শুধু পুরাতন রৌমারী থানার অন্তর্ভুক্ত মূল রৌমারীর মুক্তঞ্চলের আয়তন ছিল ১২০ বর্গমাইলেরও বেশী। এই এলাকায় আক্রমণকারী পাক বাহিনীর কোন সৈন্যের পা পড়েনি কোনদিন- গাঢ় সবুজের জমিনে আঁকা বাংলাদেশের সোনালী মানচিত্র ও রক্তলাল সূর্যখচিত বাংলাদেশের পতাকা সব সময় গর্বভরে আকাশে উড্ডীন ছিল। এর কৃতিত্ব রৌমারীর সাধারণ মানুষের, আর অদম্য সাহসী মুক্তিসেনাদের, যারা রৌমরীর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল– জীবনকে বাজী রেখে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক রৌমারীর স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত হতে দেন নি।

কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতিকাল পরেই রৌমারী নামের অঞ্চলটি, সেখানকার মানুষদের কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল; তাদের বীরত্বের কথা, তাদের সাহসের কথা এবং তাদের ত্যাগের কথা আমরা অক্লেশে ভুলে গেলাম। কিন্তু এসব কথায় যাওয়ার আগে জেনে নেয়া যাক কোথায় এই রৌমারী ?

কোথায় এই রৌমারী ?

আসাম উপত্যকার ধুবরী জেলা থেকে কুড়িগ্রাম জেলার শীর্ষে ব্রহ্মপুত্র নদ নামের যে বিপুল জলস্রোত আসাম সীমানত পেরিয়ে বাংল দেশে প্রবেশ করছে তার মুখেই পূর্বপারে ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেষে বিশাল ভূখণ্ড তাই রৌমরী নামে পরিচিত। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ বিচারে এ ভূখণ্ডের অবস্থান মোটামুটি ২৫°২২′ থেকে ২৫°৪৪′ উ. অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৪′ থেকে ৮৯°৫৩′ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। প্রশাসনিক দিক থেকে রৌমারী কুড়িগ্রাম জেলার অধীনে। পূর্বসীমান্তে মোটামুটি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত মেঘালয় থেকে নেমে আসা ক্ষুদ্র নদী জিনজিরাম মেঘালয় থেকে রৌমারীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মূল ভূখন্ডটির উত্তরতম প্রান্তটি সুচের মত ক্রমশ চিকন হয়ে উত্তরে আসাম রাজ্যেও গোয়ালপরা জেলাকে স্পর্শ করেছে, এরই বাম পাশে ব্রহ্মপুত্রের একটি চর 'সাহেবের আলগা' ইউনিয়ন যা প্রশাসনিক দিক দিয়ে উলিপুর থানাধীন। রৌমারীর পূর্বসীমান্তে রয়েছে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য- সীমান্তের লাগোয়া মানকার চর, এক কালের প্রসিদ্ধ নদীবন্দর, দক্ষিণে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার ডাংধরা (সানন্দবাড়ী) ইউনিয়ন আর পশ্চিমে গাইবান্ধা জেলার কাপাশিয়া, সুন্দরগঞ্জ ও কামরিজানি থানার চরাঞ্চল এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে কুড়িগ্রাম জেলার অধীন প্রসিদ্ধ নদী বন্দর চিলমারী। যুদ্ধকালে রৌমারী ছিল বৃহত্তর রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার একটি থানা। রৌমারী সেই ব্রিটিশ যুগে ১৯১২ সালে থানার মর্যাদা লাভ করে। রৌমরী থানাভবন ছিল অন্যন্য অনেক থানাভবনের মধ্যে ইর্ষণীয়। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর সাবেক রৌমারী থানাকে দুটি স্বতন্ত্র থানায় ভাগ করা হয়– রাজিবপুর, কোদালকাঠি ও মোহনগঞ্জ ইউনিয়ন নিয়ে গড়ে ওঠে নতুন থানা রাজিবপুর, আর দাঁতভাঙা, শৌলমারী, বন্দবেড়, রৌমারী ও যাদুরচর নিয়ে থেকে যায় মূল রৌমারী থানা। ১৯৮৩ সালে থানা দুটিকে উপজেলা স্তরে উন্নীত করা হয়। আগেই বলেছি উত্তর-দক্ষিণে ১৯ মাইল দীঘল সাবেক রৌমারীর আয়তন ৩৩৪ বর্গ-কিলোমিটার বা ১২০ বর্গমাইল। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুসারে এর জন সংখ্যা ছিল এক লক্ষ নব্বুই হাজার আট শত নব্বুই– অধিকাংশই মুসলমান; হিন্দু জনসংখ্যা সে সময় ছিল মাত্র ১,০৬২ জন ।

© www.mukto-mona.com

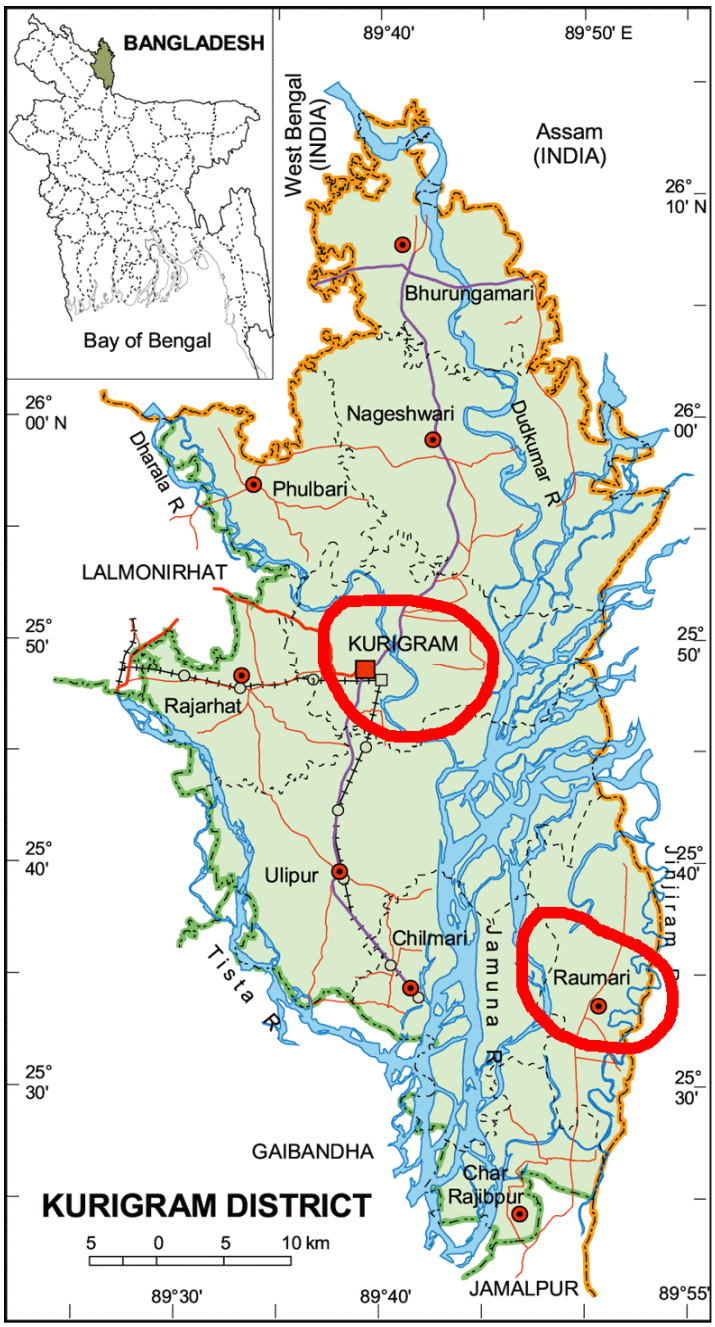

চিত্র ১ ঃ রৌমারী – যুদ্ধকালে এটি ছিল কুড়িগ্রাম জেলার একটি থানা

উত্তর থেকে কুচবিহার, বৃহত্তর রংপুর, আসামের ধুবরী-গোয়ালপাড়া থেকে আগত ভাওয়াইয়া সংস্কৃতি ভাষার মানুষ, মেঘালয় থেকে আসা অরন্যক মানুষ আর দক্ষিণ থেকে জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর-মৈমনসিংহ থেকে বঙ্গাল ভাষা আর ভাটিয়ালী সংস্কৃতির মানুষ মিলে আজকের রৌমারীর মানুষ রচনা করছে একটি কম্পেজিট সংস্কৃতি ও জনমিতি। পুরো অঞ্চলটিই বিভিন্ন সময়ে জেগে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর ক্রমশ জোড়া লেগে রৌমারী নামের এই বৃহৎ ভূখণ্ড গড়ে উঠেছে গত

© www.mukto-mona.com

৩০০ বছরের'ও অধিক কাল ধরে। একথা বোঝার জন্য ভূতাত্ত্বিক হওয়ার প্রয়োজন নেই সাদা চোখেই বোঝা যায় - সারা অঞ্চলের অনেক গ্রাম - ইউনিয়নের নামের সাথে যুক্ত হয়ে আছে চর শব্দটি-- চর রাজীবপুর, চর শৌলমারী, চর বোয়ালমারী, চর ফুলবারী, চর খেদাইমারী, যাদুর চর, কুঠির চর, বাঞ্ছার চর, বেহুলার চর, টাপুর চর, ধনার চর, পালের চর, ফুলুয়ার চর ইত্যাদি। কাশফুল, বিন্যা আর নল-খাগরা সহ বিভিন্ন জাতের বন্য ঘাস-বাঁশ জাতীয় ওষুধি বনে অগম্য ছিল এসব এলাকা। জন বসতি ছিলই না বলে চলে একশত বছর আগেও।
কবে ইতিহাসের কোন লগ্নে এ এলাকা জন-মানুষের পদচারণায় ধ্বনিত হয়েছিল এবং সভ্যতার স্পর্শে এসেছিল-- তা হতে পারে ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। এখানকার মানুষ বলে ব্রহ্মপুত্র-জিঞ্জিরাম-সোনাভারি-হলহলিয়া নদী বিধৌত এই রৌমারীর ইতিহাস এ সব নদীর সাথে জড়িয়ে আছে। কালিকা পুরাণে সুবর্ণশ্রী বা স্বর্ণবহা নামে যে নদীর কথা উল্লিখিত হয়েছে তা হয়তো বর্তমানের সোনাভরি নদী। এই সূত্র ধরে অনুমান করা যেতে পারে অতীতে রৌমারী কামরূপের অন্তর্গত ছিল। কামরূপ রাজ্য তৎকালে চারটি পীঠে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে রংপুরাদি জেলা ও ব্রহ্মপুত্রের পাশ ঘেষে আসাম-মেঘালয়ের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকাটির নাম ছিল 'রত্নপীঠ'। যতদূর জানা যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই পাণ্ডব বর্জিত কাশ-বিন্যা-নলখাগরা শোভিত দেশে জন বসতি শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধে রৌমরী

আমাদের ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে সব অঞ্চলে মুক্ত বাংলার পতাকা কখনও নামেনি, এর মধ্যে রৌমারীর স্থান সর্বাগ্রে। এখানে মুজিবনগর সরকারের বেসামরিক প্রশাসন স্থানীয় সিভিল ও সামরিক নেতৃত্বের সহায়তায় কার্যকর ছিল সব সময়। তখন একবার কয়েকদিনের জন্য এ অঞ্চলে আসবার স্মৃতি আমার জন্য এখনও রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে দেশের অন্য এলাকার মত রৌমারীবাসীরাও ছিল উদ্বেলিত– বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাদেরবেও করেছিল সংগ্রামমুখর। চলছিল ঘরে ঘরে দুর্গ নির্মাণের প্রস্তুতি আর অসহযোগ আন্দোলন। এর মধ্যদিয়েই এল সেই ২৫শে মার্চের ভয়ঙ্কর কালোরাত্রি- রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানীরা মেতে উঠল নিরস্ত্র বাঙালীর রক্তের হোলি খেলায়।* এ সময় জাতীয় সংসদে রৌমারী-চিলমারী-উলিপুর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের জনাব সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিঞা, আর প্রাদেশিক পরিষদে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব নূরুল ইসলাম (পাপ্পু মিঞা) নির্বাচিত হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন ও তৎপরবর্তী মুক্তিযুদ্ধে এই দুই জনপ্রতিনিধি প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন কালেই বস্তুত ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎপর্য বুঝে ১০ই মার্চে রৌমারীতে গড়ে উঠেছিল সংগ্রাম পরিষদ উপদেষ্ট হিসেবে যার নেতৃত্বে ছিলেন নূরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞা, এমপিএ ও জনাব সাদাতাত হোসেন ছক্কু মিঞা। মূল কমিটি ছিল নিম্নরূপঃ

সভাপতি ঃ আজিজুল হক মাস্টার, রৌমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক
সাধারণ সম্পাদক ঃ নূরুল ইসলাম সরকার, স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি
সদস্যঃ
১। ফজলুল হক খান
২। নওশের আলী আকন্দ
৩। আবদুল জলিল পণ্ডিত
৪। দিদার হোসেন মোল্লা, চেয়ারম্যান, শৌলমারী ইউনিয়ন
৫। মতিউর রহমান মাস্টার, চেয়ারম্যান, যাদুর চর ইউনিয়ন
৬। সলিম উদ্দীন আহমেদ, চেয়ারম্যান, রাজিবপুর ইউনিয়ন
৭। কদম আলী দেওয়ান, চেয়ারম্যান, বন্দবের ইউনিয়ন
৮। আব্দুল গফুর সরকার ব্যাপারী, স্থানীয় ব্যাবসায়ী
৯। নিবারণ চন্দ্র সাহা, স্থানীয় ব্যাবসায়ী
১০। আয়নাল হক

*হোলিখেলা : দোল পূর্ণিমার দিনে হিন্দুদের রংখেলার উৎসব

© www.mukto-mona.com

১১। কাজী নিজামুদ্দিন
১২। শেখ আব্দুল করিম
১৩। জয়নাল আবেদীন
১৪। রুস্তম আলী দেওয়ান, স্কুল শিক্ষক

প্রতিটি ইউনিয়নেও একটি করে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। সে সময় রৌমারীতে ছয়টি ইউনিয়ন ছিল ঃ রৌমারী, দাঁতভাঙ্গা, শৈলমারী, বন্দবের, য়াদুর চর ও রাজিবপুর। এক কথায় বলা যায় এ সব রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে রৌমারী রণাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সহায়ক শক্তি হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রি ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাঃ রৌমারীর প্রাথমিক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ছিল কয়েকটি পর্ব। প্রথম পর্বটি ছিল ই.পি.আর, ই.বি.আর, আনসার-পুলিশ সমন্বয়ে স্বতঃভাবে গড়ে ওঠা মুক্তি যোদ্ধাদের অসংগঠিত স্থানীয় প্রতিরোধ যুদ্ধ– এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় সরকারী প্রশাসন এবং স্থানীয় বাঙালী সামরিক অফিসারবৃন্দ। অনেক জায়গায় সামরিক অফিসারও পাওয়া যায় নি, সে ক্ষেত্রে ই.পি.আর সুবেদার ও পুলিশ অফিসার, এমন কি বেসামরিক নেতাকেও নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। এই অসংগঠিত কালের বিস্তৃতি মোটামুটিভাবে বলা যায় ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেই আমাদের স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, আর পাকিস্থানী দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল দখল কওে নেয়, কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া। রৌমারী সেই উজ্জ্বল ব্যতিক্রমেরই একটি।

২৫শে মার্চের ঢাকায় গণহত্যার খবর রৌমারীতেও পৌঁছায়। রৌমারী থানা সদরে সে সময় বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল ভি.এইচ.এফ পাবলিক কল অফিস। এই ওয়াললেস স্টেশনটিতে ২৬শে মার্চের অতি প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি জরুরী বার্তা ধরা পড়ে। বার্তায় বলা হয় যে ২৫শে মার্চে রাতে পাক সেনাবাহিনী মেশিনগান, কামান নিয়ে নিরস্ত্র সহরবসীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করেছে, তারা পীলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ দপ্তর আক্রমণ করেছে, পথে পথে যুদ্ধ চলছে; বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন ও সাড়ে সাতকোটি মানুষকে এই স্বাধীনতা রক্ষার ডাক দিয়েছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। বার্তাটি প্রেরণ করা হয়েছিল প্রাদেশিক গণ পরিষদ সদস্য জনাব নূরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞার নামে। সে সময় ওয়াললেস স্টেশনটিতে কর্মরত অপারেটর জনাব আনোয়ার হোসেন এর গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ পাপ্পুমিঞার কাছে পৌঁছে দিলে- তিনি দ্রুত সংগ্রমি পরিষদের সদস্যদের নিয়ে জনাব আজিজুল হক মাস্টারের বাসায় মিলিত হন।

চিত্র ২ঃ ২৫শে মার্চের গণহত্যা– শিল্পীর চোখে

© www.mukto-mona.com

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই বাণীর তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন নি। তাঁরা সংগঠিত হয়ে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, কেন্দ্র থেকে কোন নেতার নির্দেশের অপেক্ষা করেন নি। ২৬শে মার্চ সকালেই ১১টায় রৌমারী জি. এন. হাইস্কুলের প্রাঙ্গনে সবুজ জমিনে সোনালী মানচিত্র আর রক্তলাল সূর্যকে বুকে ধারণ করা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে উড্ডীন করা হল– যে পতাকা রৌমারীতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আর কখনও অবনমিত হয় নি।* বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার বানী জনতার সামনে পড়ে শোনান হলে জনতা 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে একে স্বাগত জানাল। এক কণ্ঠে জনতা শপথ নিল এই স্বাধীনতা রক্ষার- যে শপথ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

বাতাসে তখন গুজবের গন্ধ ভেসে বেরাচ্ছে 'শেখ মুজিবকে বন্দী করে পাকিস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে', 'বঙ্গবন্ধুকে হত্য করা হয়েছে' .. .. পাকিস্তান বাহিনী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে তাদের হাত থেকে দেশ উদ্ধার করেছে। .. ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ক্রান্তি লগ্নে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন, জনগণের মনোবলকে চাঙ্গা রাখতে। তারা জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চেও ভাষণের নানা অংশ, 'বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন- গোপন অবস্থান থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন', ইত্যদি বাণী সম্বলিত নানা পোস্টার, লিফলেট সীমান্তের ওপার থেকে ছাপিয়ে এনে সারা শহর-দেকানপাট-বাড়ী বাড়ী এবং গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ২৮শে মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্বগঠিত সংগ্রাম পরিষদের সভায় আসন্ন কার্যক্রম স্থির করা হয়, যার মধ্যে একটি ছিল অনতি বিলম্বে যুদ্ধে যোগদানের জন্য স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সিভিল প্রশাসন অব্যাহত রাখা, শান্তি শঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, আর সর্বোপরি শত্রুর ওপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা .. .. । এই সভায় স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এর মধ্যে নূরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞা ও জনাব আজিজুল হক মাস্টারের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তাৎক্ষনিকভাবে রৌমারী হাইস্কুল প্রাঙ্গনে শুরু হয় ডামি রাইফেল দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্ব। এই ক্রান্তিকালে সৌভাগ্যবশত ইবিআর ও ইপিআরের নায়েক ও পুলিশ যথা নায়েক আতাউর রহমান, নায়েক খাদেমুল ইসলাম, নায়েক চান মিঞা, নায়েক কছিবর রহমান, নায়েক সিরাজুল হক, নায়েক নজরুল ইসলাম, নায়েক ফাইজুল হক, নায়েক শাহজাহান আলী, নায়েক জয়নাল আবেদীন, হাবিলদার রিয়াজুল, সুবেদার আবদুর রহিম প্রমূখ বেশ কয়েক জন সদস্য ছুটিতে অবস্থান করছিলেন। নেতৃবৃন্দ এদের হাতেই যুবকদের সামরিক শিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। নায়েক আতাউর রহমান স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৬শে মার্চ থেকেই স্থনীয় এক হাজার যুবকে নিয়ে গঠিত হল ভবিষ্যতের মুক্তিযোদ্দদের নিউক্লিয়াস, বাশের লাঠি আর কাঠের নকল বন্দুক নিয়ে শুরু হল প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ।

জনগণ কর্তৃক রৌমারী থানা দখল

এ সময় রৌমারী থানার তৎকালীন ওসি আবুল হোসেন জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে দু'জন গুপ্তচরের মাধ্যমে পাকসেনাদের ঘাটি যমুনার ওপারে চিলমারীতে ও তিস্তামুখ ঘাটে খবর পাঠাতে চেষ্টা করেন– রৌমারীতে সেনাবাহিনী পাঠানোর অহ্বান জানিয়ে। সে সময় তিস্তামুখ ঘাটে ক্যাপ্টেন নোয়াজেশের নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনী পাক বাহিনীর সাথে প্রবল যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের সাহায্যের জন্য রৌমারীতে অবস্থানরত বর্ডার পোস্টের ইপিআরের জোয়ানরা ভারতীয় বিএফ এর কাছ থেকে আরও কিছ অস্ত্র নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়- এই অভিযানে নায়ক খাদেমুল ইসলাম নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে থানার ওসির মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তিনি পুলিশের সহায্যে 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনিও তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশেরা এতে সাড়া দেয় নি। এরও আগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ থানার রাইফেল গুলোকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য চাইলে তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন। জনতার হাতে এই দুই গুপ্তচর ধরা পড়লে– জনতা থানা ঘেরাও করে ওসিকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে। বন্দী আবুল হেসেনকে নেতৃবৃন্দ সীমান্তবর্তী ইপিআর বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে। নেতৃবৃন্দ থানা ধখল করে থানা থেকে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণে কাজে লাগায়। এভাবেই স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এল প্রথম অস্ত্র যোগান। থানায় তখন ছিল ১০-১২টি ৩০৩ রাইফেল। এদিকে পাকিস্থানী বাহিনীও বসে ছিল না। উত্তর দিক থেকে রংপুর-কুড়িগ্রামে অবস্থান দৃঢ় করে তারা গাইবান্ধা ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপারে সুদৃঢ় ঘাটি গড়ে তোলে। রৌমারীর ঠিক বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপারে নদীবন্দর চিরিরবন্দর

* এখানে উল্লেখ্য যে জনাব আজিজুল হকের সহধর্মিণী রিজিয়া বেগম মানচিত্র খচিত একটি বড় মাপের বাংলাদেশের পতাকা নিজের সেলাইর মেশিনে তাড়াতাড়ি তৈরী করেদিয়েছিলেন।

© www.mukto-mona.com

সেরকমই একটি শক্ত পাক ঘাটি, যা ছিল রৌমরারী প্রতিরক্ষার একটি বিরাট হুমকি; এছাড়া উলিপুর থানাতেও পাকিস্থানীরা স্থানীয় রাজাকারদের আর একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে।

এদিকে অগ্রসরমান পাক বাহিনী যাতে তিস্তা নদী অতিক্রম করে উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য বৃহত্তর রংপুরের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার ইপিআরের জোয়ানরা তিস্তা ব্রীজের পারে নদীকে সামনে রেখে পাক বাহিনীকে রুখতে এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করেছিল। রৌমারী ও পাশ্ববর্তী সীমান্ত আউট পোস্টের ইপিআর সেনাদের একত্রিত ও সংগঠিত করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিঞা, নূরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞা ও জনাব আজিজুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধার দল তিস্তা ব্রীজের কাছে অবস্থানরত ইপিআর বাহিনীর সাথে যোগ দেন। কিন্তু দূঃখজনক হলেও ভারি অস্ত্রে সজ্জিত বিপুল পাক বাহিনীর চাপে মুক্তিযোদ্ধরা তিস্তা ব্রীজ এলাকা থেকে সরে যায় সীমান্ত এলাকার দিকে। পাকিস্থানী সেনাবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাপারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রৌমরীর নেতারাও তাদের দল নিয়ে রৌমারীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর মধ্যেই স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সীমান্তের ওপারে ভারতের বি.এস.এফ এর সামরিক অধিকর্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাদের আমন্ত্রণে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল মেঘালয়ে বি.এস.এফ এর হেড কোয়ার্টারস তুরায় মিলিত হয়েছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিলঃ

- মেঘালয়ে ও আসামে আশ্রয় নেয়া শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্যা
- রৌমারীর মুক্তাঞ্চলের সাথে মেঘালয় ও আসামের সাথে আন্তর্জাতিক সীমানা অবাধ যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য খোলা রাখা, তবে শত্রুপক্ষ যাতে এই সুবিধা গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহপর করতে না পারে সে লক্ষ্যে নজরব্যবস্থা জোরদার করা
- রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও কি ভাবে সুদৃঢ় করা যায়। রৌমারীকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখা শুধু যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন, তাই নয় মেঘালয়ে ভারতীয় সামরিক কৌশলগত স্বার্থেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রৌমারী ছিল মেঘালয়-আসাম ও পাকিস্থানী অধিকৃত গাইবান্ধা-কুড়িগ্রাম এবং দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর-শেরপুরের মধ্যে অবস্থিত বাফার জোন। রৌমারী পাকিস্থানীদের দখলে চলে এলে মেঘালযের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিশাল অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাক বাহিনীর সরাসরি হুমকির আওতায় চলে আসবে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ভারতীয়দের এ বিষয়টি মনে হয় বোঝাতে পেরেছিলেন।
- রৌমারীতে একটি আধুনিক মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য একটি আধুনিক সমর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার সর্বাত্মক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ছাড়া মেঘালয়ের পূর্বাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধদের প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তোলা।
- রৌমারী প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের যথা প্রয়োজনীয় আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জমাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মনে হয় উভয় পক্ষের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায় যে ঐ সভায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। রৌমরারীর জন প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নূরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞা, ফজলুল হক খান, আজিজুল হক প্রমুখ।

© www.mukto-mona.com

ঠাকুরের চরের একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ।

ছবি : হারুন হাবীব।

চিত্র ৩ঃ এরাই রৌমারীকে মুক্ত রেখেছিল দীর্ঘ নয় মাস

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ঘটে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম অঞ্চলে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি বাহিনী শত্রুর চাপ প্রতিরোধ করতে না পেরে সুবেদার আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে রৌমারীতে অবস্থান নেয়। এর আগে সুবেদার আলতাফের অধীনস্থ বাহিনীটি দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে অবস্থান করছিল। তারা পলাশবাড়ী হযে গাইবান্ধার পশ্চাতে অবস্থান নেয়। কিন্তু শত্রুর প্রবল চাপ রোধ করতে না পেরে সুবেদার আলতাফ ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে দেওয়ানগঞ্জের উত্তরতম প্রান্তে মেঘালয়ের সীমান্ত ঘেষে অবস্থিত পাথরের চরে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যেই পাথরের চর বর্ডার পোস্টের ইপিআর সৈন্যরা লৌমারীতে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল। রৌমারীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে সুবেদার আলতাফ ভারতের মধ্য দিয়ে মানকার চর হয়ে রৌমারীতে উপনীত হন। নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীকে আলতাফ বাহিনীর সাথে যুক্ত করে তারা রৌমারী প্রতিরক্ষার সর্বিক দায়িত্ব আলতাফকে প্রদান করেন। সুবেদার আলতাফ ছিলেন একজন দক্ষ সেনানী। অচিরেই তিনি রৌমারীর চারদিকে একটি চমৎকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন, যেমন ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারে ঠাকুরের চর, কোদালকাঠি, টাপুর চর ও কর্তিমারী সহ সামরিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেন। রাজীবপুরে স্থাপন করলেন তাঁর সামরিক সদর দপ্তর। তিনি জুলাই মাস পর্যন্ত এ অঞ্চলের অপ্রতিরোধ্য সেনাপতি হিসেবে আভির্ভুত হয়েছিলেন। তিনি বেসামরিক প্রশাসনেও গতিশীলতা আনেন এবং এর ওপরও সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। এর ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে তার মতদ্বৈততা দেখা দেয়, যা মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক পরিচালনায় নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন যে সিভিল প্রশাসনের আওতায় থেকেই সুবেদার আলতাফ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন, শুধু সামরিক অভিযানের কৌশল নির্ধারণে তাঁর থাকবে একছত্র অধিকার। কিন্তু বেসামরিক প্রশাসনে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করবেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, তরে যুদ্ধনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক প্রশাসন উভয়রই। আর সুবেদার চাইতেন সামরিক শাসনের অনুরূপ বেসামরিক ও সামরিক সকল ব্যাপরে তিনিই হবেন সর্ব ক্ষমতাধর। তিনি কালে এতই ক্ষমতাধর বলে নিজেকে মনে করতেন যে শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত রৌমারীর সর্বাধিনায়ক ও প্রধান প্রশাসক ঘোষণা করেছিলেন। মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের আওতায় তাকে আনার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমন কি বি.এস.এফ কমান্ডের মাধ্যমে তার ওপর চাপ প্রয়োগে্ও কোন কাজ হয় নি। তাকে বাগে আনা যায় নি। বি.এস.এফের আমন্ত্রণে মেঘালয়েও যেতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তার ক্ষমতা হ্রাস ও তাকে নিয়মিত বাহিনীর ও প্রশাসনের বাগে আনার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অন্য কৌশল গ্রহণ করলেন। তারা ভারতীয় সহায়তায় রৌমারীতে সুবেদার আলতাফের বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটি বাহিনী গড়ে তুললেন। এর মধ্যে

© www.mukto-mona.com

উল্লেখযোগ্য দুটি বাহিনী হল সামাদ ও মাহবুব বাহিনী। এর ফলে সুবেদার আলতাফের ক্ষমতা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল।

এ সময়কার আর একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। ৫ই এপ্রিল তারিখে হঠাৎ করে জননেতা মওলানা ভাসানীর রৌমারীতে উপস্থিতি। ২৫শে মার্চের ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর আক্রমণের সময় সন্তেষের কাগমারীতে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়েই তিনি, প্রত্যুতপন্নতার সাথে নৌকায় করে সম্ভবত সিরাজগঞ্জের পাশ দিয়ে যমুনা নদীপথে বহাদুরাবাদ থেকে জিঞ্জিরাম নদী দিয়ে রৌমারীতে উপনীত হয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে উল্লসিত স্থানীয় নেতারা মওলানাকে রৌমারীতে নিয়ে আসার জন্য নৌকা ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু সবাইকে হতাশ করে নৌকা থেকে নামতে অস্বীকার করেন। পাল্টা তিনি নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাঁর ভারতে প্রবেশের ব্যবস্থা করার। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী অনুমতি না দিলে তিনি ভারতের মাটিতে পা রাখবেন না। নেতৃবৃন্দ দ্রুত মানকার চরে বিএসএফ কর্তৃপক্ষের কাছে মওলানার ইচ্ছে জানান হয়। বিএসএফ' এর তুরা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করলে প্রধান মন্ত্রী সাথে সাথে নির্দেশ দেন যে জননেতাকে যেন সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে সীমান্ত থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয় অতিথি হিসেবে। সেদিনই সন্ধ্যায় মানকার চর থেকে বিএসএফ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি শ্রীমতী গান্ধীর আমন্ত্রণ বার্তা নিয়ে রৌমারীতে এসে মওলানাকে মানকার চরে নিয়ে যায়। পরদিন মওলানা ভাসানী গ্যেহাটি হয়ে দিল্লী পৌঁছে চান বিএসএফ এর তত্বাবধানে, সেখানে তিনি প্রধান মন্ত্রীর আথিত্য গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন এবং বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হন।

জুন-জুলাই মাসে জেড ফোর্স গঠিতে হলে এর হেড কোয়র্টার তেলঢালায় ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে যোগ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। পুনর্গঠিত ৩য় বেঙ্গল তখন পশ্চিম দিনাজপুর রণাঙ্গনে অবস্থান করছিল। পুর্ব পরিচিত ক্যাপ্টেন আনোয়ারের সাথে আলতাফ যোগাযোগের চেষ্টা করলে মিত্রবাহিনীর অনুরোধে ক্যাপ্টেন আনোয়ার সুবেদার আলতাফকে নিয়মিত বাহিনীর কমাণ্ডের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এর পর থেকেই তেলঢালা কমান্ডের নিয়ন্ত্রনে আলতাফ বাহিনীর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আর একবার মানকার চরে বি. এস. এফের সামরিক অধিকর্তদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন- দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এম.পি.এ জনাব পাপ্পু মিঞা। এবারের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধদের জন্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা। সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন ১০ জনের একটি তরুণ মুক্তিযোদ্ধার দল যাতে ছিলেন– আব্দুল মজিদ (টালূযার চর), আজিজুর রহমান ও আবুল কাশেম (খঞ্জনমারা), জয়নাল আবেদীন (বন্দবের), খন্দকার শামসুল হক, আব্দুল আজিজ, নুরুজ্জামান ও আব্দুল মান্নান (রৌমারী), ফজলুল হক (নটান পাড়া), এবং আতাউর রহমান (বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এবং রৌমারীর মুক্তিবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক)। মানকার চরে বি.এস.ফ ক্যাম্পে দু্তিন দিন ধরে অস্ত্রশিক্ষা দান করা শেষ হলে ১০ বোঝা অস্ত্র নিয়ে দলটি রৌমারীতে যাদুরচরে মতিউর রহমানের বাসায় অস্ত্রসহ রিপোর্ট করে। অস্ত্রসহ ক্ষুদে দলটিকে ইতিমধ্যেই আসা আলতাফ বাহিনীতে যুক্ত করে দেয়া হয়। চিলমারী থেকে পাক বাহিনী রৌমারীর দিকে অভিযান চালালে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারে পজিশন নেয়া এই বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে। ব্যর্থ হয়ে, পাক বাহিনী চিলমারীতে একটি শক্ত দুর্ভেদ্য ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে।

জেড ফোর্স গঠন ও রৌমারীতে নতুন সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

২৬শে মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত রৌমারী রণাঙ্গনে যে সামরিক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে তা মূলতঃ স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা স্বতস্ফুর্তভাবে স্থানীয় যুবকদের ও সীমান্তঘাটিতে অবস্থানরত ইপিআর জোয়ানদের মিলিত একটি মুক্তিবাহিনী। বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বও নিয়েছিল স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। জুন মাসের পর পরই রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সকল সামরিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমাণ্ড। তেলঢলায় প্রতিষ্ঠিত জেড ফোর্সের সরাসরি কমাণ্ডে চলে আসে রৌমারীর সামরিক প্রতিরক্ষা। বেসামরিক প্রসাশনও চলে আসে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আওতায়। এটি একটি তাৎপর্যময় পরিবর্তন।

পুনর্গঠিত ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট

© www.mukto-mona.com

৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে রৌমরী রণাঙ্গনের ছিল একটি নিবিড় সম্পর্ক, তাই এ বাহিনী সম্পর্কে কিছ বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্চ মাসে ৩য় বেঙ্গল সৈয়দপুরে অবস্থান করছিল। কিন্তু ৩য় বেঙ্গলের গতিবিধির ওপর ছিল পাকিস্থানী সেনা কর্তৃপক্ষের কড়া খবর দারী। বিভিন্ন কোম্পানীগুলোকে ছলছুতো করে ভারতীয় আগ্রাসন ঠেকানোর নামে সীমান্ত এলকায় পাঠিয়ে দেয়া হতে থাকে। যেমন আলফা কোম্পনীকে পার্বতীপুরে, চার্লি কোম্পানীকে ক্যাপ্টেন আশরাফের নেতৃত্বে ঠাকরগাঁয়ে আর ব্রাভো ও ডেলটা কেম্পানীকে পলাশবাড়ী ও ঘোড়াঘাটে অবস্থান নিতে পাঠানো হয়েছিল। তবুও ২৫শে মার্চের পর সার্বিক যুদ্ধ শুরু হলে ৩য় বেঙ্গলের সৈনিকেরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে শত্রুর মোকবেলা করে। অসম যুদ্ধে সৈয়দপুরের ক্যান্টনমেন্টে আবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩য় বেঙ্গলের অবশিষ্ট সদস্যরা যুদ্ধ করতে করতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লে. সিরাজ ও সুবেদার মেজর হারিস। দুঃখের বিষয় লে. সিরাজ পরবর্তীকালে পাকিস্থানীদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। এক দল অবস্থান নেয় বদরগঞ্জে, অন্যদলটি সরে আসে ফুলবাড়ি এলাকায়। পলাশবাড়ীতে অবস্থানরত কোম্পানী দুটির নেতৃত্বদান কারী অফিসার লে. রফিককে আলোচনার নামে ডেকে পাঠিয়ে পাকিস্থানীরা তাকে বন্দী করে রংপুর ক্যান্টমেন্টে নিয়ে যায় ও পরে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩য় বেঙ্গলের দু জন সেনা শহীদ হয়। ৩য় বেঙ্গলের সাহসী সৈন্যরা ছরিয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থাতেও দিনাজপুর ও রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঠাকরিগাঁও ও পার্বতীপুরে ৩য় বেঙ্গলের দুটি কোম্পানী প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই বাহিনী দিনাজপুরের নানা এলাকায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অতঃপর গোটা ৩য় বেঙ্গল সংঘবদ্ধ হয় চরখাই অঞ্চলে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে। মে মাসের মাঝামঝি সময়ে অবশিষ্ট ৩য় বেঙ্গলের সেনাদল ভারতে বালুরঘাট অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তখন থেকেই নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে ৩য় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশ হেড কমান্ডের নির্দেশে ছাত্র যুবক ইপিআর ও পুলিশ ও আনসার সদস্যদের এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধদের নিয়ে গঠিত হতে থাকে নতুন ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মে মাসের শেষে ৪র্থ বেঙ্গল থেকে ডেকে এনে মেজর শাফায়াত জামিলকে দেয়া হল ৩য় বেঙ্গলের দায়িত্বভার। বালুরঘাটে স্থাপিত হল হেড কোয়ার্টার ও প্রশিক্ষণ শিবির। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ট্রেনিং সমাপ্ত করে তৈরী হয় ১১০০ সেনা সদস্য বিশিষ্ট রেজিমেন্ট মেজর শাফায়াত জামিলের কুশলী নেতৃত্বে।

জুন মাসে বাংলাদেশ সরকার ব্রিগেডিয়ার স্তরে তিনটি নিয়মিত স্থলবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হাই কমান্ডের নির্দেশে মেজর জিয়ার ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিউক্লিয়াস করে ১ম ব্রিগেড তৈরীর কাজ শুরু হয় জিয়াউর রহমানকে ২০শে জুন তারিখে ব্রিগেড প্রধান নিযুক্তির মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্যেই মেজর জিয়াকে ১নং সেক্টরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মেঘালয়ে বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে গাড়ো পাহারের পাদদেশে গভীর অরণ্যে তেলঢালা নামক স্থানে ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়। ছোট ছোট পাহাড়ঘেরা ঘন অরণ্যের অভ্যন্তরে সাপ, বন্য শুকর আর বাঘের আস্তানার পাশাপাশি স্থাপন করা হল বেশ কিছু সামরিক ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র– মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শিবির স্থাপনের আদর্শ জায়গা। পশ্চিম দিকে কালা নদী পার হলেই রৌমারীর বিশাল মুক্তাঞ্চল, অদূরেই পূর্ব দিকে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের বিএসএফ' এর বড় সামরিক ঘাটি তুরা। এর পাশেই রয়েছে পশ্চিমে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেষে ইতিহাস খ্যাত মানকার চর, আর একটু দক্ষিনে বাংলাদেশের কামালপুর বোর্ডার পোস্টের লাগোয়া মহেন্দ্র গঞ্জ। এই দুই স্থানেই স্থাপন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও ইয়ুথ ক্যাম্প। তাছাড়া ভারতীয় সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত শরণার্থী শিবির সমুহে আশ্রয় নিয়েছে- পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও মৈমনসিংহ থেকে আগত লাখো মানুষ। এখানে বলা প্রয়োজন যে মুক্তিযুদ্ধকালে মানকার চর নানা দিক থেকে আমাদের যুদ্ধে অবদান রেখেছে। মানকার চর সুদূর অতীতকাল থেকেই আসাম-বাংলার মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীবন্দর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে এসেছে। বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ ও বিশাল আকারের নৌকা এই বন্দর হয়ে গৌহাটি অবধি যাতায়াত করত। মানকার চরে একটি টিলার উপরে রয়েছে হিন্দুদের পরম তীর্থ কামাখ্যা দেবীর মন্দির; মোগল সম্রাট অররঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) নির্দেশে সপ্তদশ শতাবদীতে মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সৈনাধ্যক্ষ মীর জুমলা এই মানকার চরের ভেতর দিয়েই আসাম অভিযান করেছিলেন। তবে আসাম-মেঘালয়ের ঘন জঙ্গল, পর্বত-নদীসঙ্কুল দূর্গমপথ, আর মেলেরিয়াসহ প্রবল জ্বর আসাম অভিযানে তাঁকে তেমন সাফল্য এনে দিতে পারে নি, যদিও কিছুকিছু অঞ্চল মোগলদের অধিকারে এসেছিল সাময়িকভাবে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরই অহম বিদ্রোহীরা মোগল সৈন্যদেও বিতাড়িত করে। তিনি দূরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মানকার চরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, এখানে একটি টিলায় তাঁকে সমাধিস্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে পিতৃসিংহাসন দখলে ভ্রাতিঘাতী যুদ্ধে মীরজুমলা আওরঙ্গজেবেকে প্রভুত সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর মীরজুমলার প্রভাব অতিমাত্রায় বিস্তার পাওয়ায় তাঁর ক্ষমতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে সম্রাট তাঁকে সুবে বালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

© www.mukto-mona.com

বিভাগপুর্ব কালে মৌলানা ভাসানীর রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল এই মানকার চর। ব্রহ্মপুত্রের উভয় অঞ্চলের অনেক মানুষ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক অনুসারী এবং অধ্যাত্মিক মুরিদ। সাতচল্লিশের ভারত বিভাগে মানকার চর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে মৌলানা এখানে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, এই আন্দোলনের নাম ছিল 'বাংলার কেল্লা'। খবর পেয়ে লাঠি, বল্লম, দা, কুঠার ও হরেক রকম অস্ত্রে সজ্জিত রৌমারীর হাজার হাজার মানুষ সেদিন ছুটে গিয়েছিল মানকার চরে জননেতার ডাকে। কিন্তু বাংলা-আসাম ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ এই আন্দোলনকে সমর্থন না দেয়ায় তা কিছুদিনের মধ্যে দমিত হয়।

কিছুদিনের মধ্যে ক্যাপ্টেন আমিনুল হকের নেতৃত্বে ৮ম বেঙ্গলের অবশিষ্ট সৈন্য চট্টগ্রামের রামগড় থেকে তেলঢাকায় এসে পৌঁছাল, বনগা থেকে যোগ দিল ক্যাপ্টেন হাকিমের নেতৃত্বাধীন প্রথম বেঙ্গল। ইতিমধ্যে শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সুসংহত ৩য় বেঙ্গল হাইকমান্ডের নির্দেশে তেলঢালায় উপনীত হয় ১৮ই জুন তারিখে পশ্চিম বাংলার রায়গঞ্জ থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। ৩য় বেঙ্গল পরিণত হয় ১ম ব্রিগেডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাংশে ব্যাটিলিয়ন হিসেবে। ১ম বেঙ্গল, ৩য় বেঙ্গল আর ৮ম বেঙ্গল এই তিনটি ব্যাটিলিয়ন নিয়ে গড়ে উঠল এই ব্রিগেড যার নাম পরবর্তীকালে নির্দ্ধরিত হল 'জেড ফোর্স - ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমানের আদ্যাক্ষর অনুসারে। ব্যাটিলিয়ন তিনটির প্রধান ছিলেন যথাক্রমে– মেজর মইনুল হোসে চৌধুরী, মেজর শাফায়াত জামিল এবং ক্যাপ্টেন আমিনুল হক। ব্রিগেড মেজর ও ডি. কিউ ছিলেন যথাক্রমে ক্যাপ্টেন অলি আহাদ ও ক্যাপ্টেন সাদেক।

কিছুদিন আগে পরে ৮ম বেঙ্গলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সাদেক, ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী, লে: মোদাসের হোসেন ও লে: এমদাদ হোসেন (পরে সিলেট রণাঙ্গনে শহীদ হন)। প্রথম বেঙ্গলের সাথে যুক্ত অফিসারেরা ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহমুব, ক্যাপ্টেন আলাউদ্দীন ও লে: মান্নান। ক্যাপ্টেন সালাউদিদীন ও ক্যাপ্টেন মাহবুব উভয়েই দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন– ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন ৩১শে জুলাই কামালপুর যুদ্ধে ও ক্যাপ্টেন মাহবুব সিলেট রণাঙ্গনে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। ক্যাপ্টেন মাহবুব প্রসঙ্গে ৩য় বেঙ্গলের নূরুন্নবী খান শ্রদ্ধার সাথে উক্তি করেছিলেন, " তিনি শিখদের মত হাতে রূপার একটি বালা পরতেন, বলতেন 'দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত হাতের চুড়ি খুলবো না' "। ৩য় বেঙ্গলের অফিসারের মধ্যে ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিল (ব্যাটিলিয়ন কমান্ডার), মেজর মকসুদ চৌধুরী (ডাক্তার), ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও লে: এস আই এম নূরুন্নবী খান; এদের সাথে পরে যোগ দিয়েছিলেন অন্য ফ্রন্ট থেকে আসা ক্যাপ্টেন মহসিন, ক্যাপ্টেন আকবর, এবং বিমান বাহিনী থেকে ফ্লাইট লেফ্টেন্যান্ট আশরাফ (ব্যাটিলিয়ন এডজুটেন্ট); এছাড়া মৈমনসিংহ মেডিকেল কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ওয়াহেদকে মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব দেযা হয়েছিল।

২৫শে জুনের মধ্যে জেড ফোর্স বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রথম সুসংগঠিত পদাতিক ব্রিগেড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তিনটি ব্যাটিলিয়নের জন্য স্বতন্ত্র শিবিরে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ চলতে থাকে দেড়মাস ধরে। একটি ব্রিগেডের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরণের অস্ত্র সজ্জিত এই বাহিনী জুলাই মাসের শেষে সম্মুখ যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। অফিসিয়ালি ২৮শে জুলাই তরিখে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়। এখন শুধু অপেক্ষা যুদ্ধযাত্রার।

দেশের অভ্যন্তরে জেড ফোর্সের প্রথম অভিযান

জেড ফোর্স যুদ্ধে কতটা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পেরেছে তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিগেড হাই কমান্ড দেশের অভ্যন্তরে তিনটি অভিযানের পরিকল্পনা করেন। অপারেশন তিনটি হল: (১) জামালপুরের উত্তরতম থানা বকসীগঞ্জের অধীনে ধানুয়া-কামালপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমতম সীমান্তে অবস্থিত কামালপুর গ্রামের বর্ডার পোস্ট কামালপুরের পাকিস্তানীর শক্ত ঘাটিটি ৩১শে জুলাই রাতে অতর্কিত ঝটিকা আক্রমণ করে দখলে নিয়ে আসা। এ অপারেশনের দায়িত্ব পড়ল প্রথম বেঙ্গলের একটি কোম্পানীর যার নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজ। কামাল পুরের সামন্য উত্তরে পাথরের চর- মেঘালয় থেকে আসা জিঞ্জিরাম নদীর ওপর সেতু, ঐ নদীটিই সামান্য বেঁকে কামালপুরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। (২) তিস্তার নদীর এপারে বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাটে পাকিস্থানীরা যে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে তা পর্যদুস্ত করে পাক অবস্থানগুলোর ধ্বংস সাধন এবং ফেরী ঘাটটিকে অচল করে দেওয়া। এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় ৩য় বেঙ্গলকে। এর সাথে পরে ব্যাটিলিয়ন কমান্ডার যুক্ত কছিলেন মেঘালয়ের সাথে বাংলাদেশের যাতায়াত সংযোগ পথকে অবাধ মুক্ত রাখতে দেওয়ানগঞ্জে অবস্থিত পাকিস্থানী অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়া। (৩) শেরপুর

© www.mukto-mona.com

জেলার ঝিনাইগাতি থানাধীন নকশী বর্ডার পোস্টে অবস্থিত পাকিস্তান বাহিনীর শক্ত ঘাটিটিকে ধ্বংস করা। তুরা গারো পাহারের রেঞ্জের দক্ষিনে বাংলাদেশের উত্তর সীমায় আশেপাশের টিলাসমুহের মাঝে একটু নীচু ভূমিতে নকশী পোস্টটি অবস্থিত । জামালপুর-শেরপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের কাছে অবস্থিত এই পোস্টটি সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে ধ্বংস করতে পারলে শেরপুর-মেঘালয় যাতায়াত সুচারু ও নিরাপদ হয়। এ কাজটি করতে বলা হয় অষ্টম বেঙ্গলকে।

কামালপুর অভিযান ঃ জামালপুর জেলার উত্তরতম থানা বকশীগঞ্জ থেকে দু'মাইল দূরে মেঘালয় সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুর গ্রামের মাঝামাঝিতে শক্তিশালী ঘাটিটির অবস্থান। এখানে পাকিস্থানীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই মজবুত– অবস্থান করছিল ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের একটি দুর্ধর্ষ কোম্পানী, আর দুটি আধা সামরিক প্লাটুন। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বেঙ্গলের দুটি কোম্পানী মহেন্দ্রগঞ্জের কাছে কামালপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং অসম সাহমিকতার সাথে কামালপুর বোর্ডার পোস্টে পাকিস্থানী সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালায়, ৩১শে জুলাইয়ের অতি প্রত্যুষে। মিত্রবাহিনীর আর্টালারী ইউনিটের সাপোর্টও দেয়া হয়েছিল আক্রমণের সূচনা লগ্নে। কিন্তু আর্টারির শেল আক্রমণকারীদের মাঝে বিস্ফেরিত হওয়ায় অসুবিধারও সুষ্টি হচ্ছিল। মূল আক্রমণকারী একটি ডেল্টা কোম্পানীর নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজ। আর অন্যটি অর্থাৎ ব্রাভো কোম্পানী পরিচালিত হয়েছিল লে. হাফিজের নেতৃত্বে। অক্সিলিয়ারী সাপোর্টের জন্য নিয়োজিত ছিল আরও দুটি কোম্পানী আলফা ও চার্লি– যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল যথাক্রমে ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং লে. মান্নান। অপারেশনের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাটিলিয়ন কমাণ্ডার মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী। সার্বিক অপারেশনের যোগাযোগ ও সমন্বয় করেছিলেন মেজর জিয়া স্বয়ং।

অগ্রগামী কোম্পানী দুটির প্রবল আক্রমণে পাকসেনারা হত বিহ্বল হয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে কাছেই একটি কমিউনিটি সেন্টারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে তারা মেশিন গানের গুলি ও মর্টার আক্রমণ তীব্রতর করে। অন্য দিকে অগ্রগামী দল দুটিকে সমন্বয়ের অভাবে পেছনের কোম্পনীটি সময়মত সাহায্য দিতে ব্যর্থ হয়। এ সময়ই মেশিনগানের আঘাতে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন গুরুতরভাক্ষ আহত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকবাহিনীর প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণে ও তীব্র প্রতিরোধের মুখে প্রথম বেঙ্গলের এই অভিযান ব্যর্থ হয়, এবং বিপুল ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধে প্রবল রক্তক্ষরণে শহীদ হন অন্য ৬৭ জন সহযোদ্ধার সাথে। যুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশ সরকার এই অসামান্য আত্মত্যাগের কারণে শহীদ সালাহউদ্দিন মমতাজকে বীরোত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। কামালপুর অভিযানে যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে মেজর জিয়া পশ্চাদাপসরণের নির্দেশ দেন। নিজে আহত অবস্থায় বেশ কিছু আহত সৈন্যসহ সকল সৈন্যকে নিয়ে লে. হাফিজ ফিরে আসতে সক্ষম হন।

নকশী অভিযান ঃ নকশী বর্ডার পোস্টের অবস্থান এবং এর গুরুত্ব সম্পকে আগেই বলা হয়েছে। পাকিস্থানীদের এই পোস্টটিরও ছিল সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনী যাতে মেঘালয় থেকে আক্রমণ চালিয়ে মৈনসিংহে প্রবেশ করতে না পারে। এটির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় নিয়েজিত ছিল পাকবাহিনীর ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের এক প্লাটুন নিয়মিত সৈন্য, এবং ইপিসিএফ, রেঞ্জার্স, ও স্থানীয় রাজাকার নমন্বয়ে গঠিত দুই প্লাটুন সদস্য। নকশী অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পান অষ্টম বেঙ্গলের অধিনায়ক মেজর এ জে এম আমিনুল হক। আক্রমণ পরিচালনার সময় নির্ধারণ হয় ৩রা আগস্ট প্রত্যুষ ৩-৪৫ ঘটিকায়। অগ্রগামী আক্রমণকারী দলে ছিল ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদের চালিত ব্রাভো এবং লে. মোদাসেরের পরিচালনায় ডেল্টা কোম্পানী দুটি। আক্রমণ দলের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ ও সহ অধিনায়ক লে. মোদাসের। এছাড়া একটি কোম্পানী নিয়েজিত ছিল পেছনে সহায়ক শক্তি হিসেবে– এটির দায়িত্ব কাট অফ পার্টি হিসবে। এই ই পি আর কোম্পানীটির নেতৃত্বে ছিল সুবেদার হাকিম। আক্রমণ কালে ও আক্রমণ পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় ফায়ার কভার ও সমর্থন দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাটিলিয়ন কমান্ডার মেজর আমানুল হক। পোস্টের অনতিদূরে সীমান্ত লাগোয়া শালবনে 'অগ্রগামী জড়ো হওয়ার এলাকায়' (forward area assembly) মেজর জিয়া অবস্থান নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় ব্রিগেড কমান্ডার এই অভিযানকে কতটা গুরুত্বেও সাথে নিয়েছিলেন। শুন্য ঘন্টায় ভারতীয় আর্টিলারির ফায়ার কভারে অগ্রগামী দল পোষ্টের ওপর আক্রমণে ঝাপিয়ে পড়ে। আক্রমণের প্রাবল্যে পাকিস্থানী সেনারা তাদের ঘাটি ছেড়ে অন্যত্র সরে গিয়ে রিগ্রুপ হয়ে মেশিন গান ও মর্টারের সাহয্যে পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। আর এ সময়ে আক্রমণের নেতৃত্বদান কারী মেশিন গানের গুলিতে গুরুতর আহত হলে বাঙারী সেনারা হতবুদ্ধি হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলে। তারা পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয়। এ দিকে যদ্ধাহত অবস্থায় ক্যাপ্টেন আমিনের শত্রুদের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, ব্যটিলিয়ন কমান্ডার

© www.mukto-mona.com

আমিনুল হক জীবনকে বিপন্ন করে দু'জন জেসিও ও এনসিও'র সহায়তায় সহযোদ্ধা আহত ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চেম্ধুরীকে উদ্ধার করেছিলেন। ফলে পাক অবস্থানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করলেও মুক্তযোদ্ধারা ঘাটিটি দখল নিতে পারে নি। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী অষ্টম বেঙ্গলর বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অভিযানের ব্যর্থতার মূল কারণ অবম্য শত্রু পক্ষের প্রবল মর্টার আক্রমণ যার প্রত্যুত্তর দেবার সাধ্য মুক্তি বাহিনীর ছিল না। এই অভিযানের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষণীয় ছিল যে সরাসরি কনভেনশনাল যুদ্ধে জয়ী হতে হলে প্রয়োজন যথেষ্ট প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা যা আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না। ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চেম্ধুরী ছাড়াও অনেক মুক্তি যোদ্ধা আহত ও কমপক্ষে ১২ জন নিহত হন – হাবিলদার নাসিরুদ্দিন, ল্যান্স নায়েক আবুল কালাম, মোঃ ইফসুফ মিঞা, সিপাই মোহাম্মদ আলী, হুমায়ুন কবীর, মোঃ সুজা মিঞা শামসুজ্জআমান, আবদুস সাত্তার, ফয়েজ আহম্মদ, আবদুস সালাম ও মোঃ হানিফ প্রমুখ।

বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট অভিযান ঃ তিস্তা নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্র-যমুনায় এসে পড়ছে, তার বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারে অবস্থিত বাহাদুরাবাদ নদী বন্দর ও ফেরিঘাট। পাক সেনাদের নদীপথে চলাচল নিরাপদ ও মুক্তিযোদ্ধা মুক্ত রাখতে পাকিস্থানীরা বাহাদুরাবাদে একটি দূর্ভেদ্য সেনাঘাটি স্থাপন করেছিল। এখান থেকে তারা চিলমারী বন্দর, কুড়িগ্রামসহ উত্তরাঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ স্থানগুলোর এবং ব্রহ্মপুত্রের উভয় পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানগুলোর ওপর কড়া নজরদারী রাখা; আর প্রয়োজনে তাদের ঘাটিগুলোর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা। জেড ফোর্স হাই কমান্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে বাহাদুরাবাদ ঘাটের অবস্থানকে নির্মূল করা না গেলেও একে যথাসম্ভব অকার্যকার করে তোলা। এ কারণে বাহাদুরাবাদ অভিযানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। আর অভিযানের দাযিত্ব অর্পিত হয় ৩য় বেঙ্গলের ওপর, এবং ব্যাটিলিয়ন কমাণ্ডার শাফায়াত জামিল বাহাদুরাবাদ অপারেশনের নীল নকসা চুড়ান্ত করেন। এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে ও লে. নূরুন্নবী খানের নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানী, একটি মর্টার প্লাটুন, ও ব্যাটিলিয়ন হেড কোয়ার্টার। স্বয়ং ব্যটিরিয়ন কমান্ডার মেজর জামিল এই অপারেশনের ফ্রন্টে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ডেল্টা কোম্পানীকে মূল আক্রমণ দল হিসেবে নির্বচিত করা হয়। পরিকল্পনা ছিল সুবিধাজনক অগ্রগামী অবস্থান থেকে ডেল্টা কোম্পনীর মুক্তিযোদ্ধরা বাহাদুরাবাদ ঘাট সংলগ্ন বার্জ ও রেলের খোলা বগিতে থাকা শত্রুদেও মেশিনগান ও মর্টার অবস্থানগুলোকে ধ্বংস করবে। অন্যদিকে আনোয়ার তার কোম্পানী নিয়ে নূরুন্নবীর পশ্চাদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবে ও পশ্চাদাপসরণের রাস্তা নিরাপদ রাখবে। আনোয়ারের সাথে থাকবে শাফায়াত জামিল। অভিযানের মাহেন্দ্রক্ষণ স্থির হয় ৩১শে জুলাই ভোর চারটায়।

ঐদিন দুপুরে কামালপুরের কাছে হয়রত শাহ কামালের মাজারের পাশ দিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ৩য় বেঙ্গলের সেনানীরা প্রবেশ করে শত্রু পক্ষের চোখে ধুলি দিয়ে। কামালপুর থেকে তিনটি ছোট বড় নদী পের হয়ে প্রায় ২৫ মাইল কাদা-পানির পথ হেটে পাড়ি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাহাদুরাবাদ ঘাটের কাছে সবুজপুরে পৌঁছে যায়। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পাওয়া ১২টি নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধরা পুরানো ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে উপনীত হয় অপারেশনাল জোনে রাত ৩ টায়। খোঁজখবর ও রেকি সমাপন করে লে. নূরুন্নবী পরিকল্পনা মাফিক ভোর ৫ টার দিকে ৪টি প্লাটুনকে নিয়ে পাকসেনাদের অবস্থানের ওপর ভীমবেগে চড়াও হয়। হতচকিত পাক সেনারা নিজেদের সামলে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নবীর কোম্পানীর ওপর মেশিনগান ও মর্টারের সহায়তায় প্রতি আক্রমণ শুরু করে। অগ্রবর্তী কোম্পানীর আক্রমণে পাকিস্থানীদের ৩টি বার্জ ধ্বংস হল, দুটো যাত্রীবাহী বগিতে বিশ্রামরত বেশ কিছু সংখ্যক পাকসেনা হতাহত হল। অর্ধঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে বাহারুরাবাদ রেল স্টেশনে রাখা অনেকগুলো এঞ্জিন বিকল হয়েছিল, তবে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় নি। মুক্তি সেনাদের মধ্যে কয়েকজন আহত হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন নায়েব সুবেদার ভুলু মিঞা, যিনি ২৫শে মার্চ রাতে দিনাজপুরে ইপিআরদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সহযোদ্ধাদের সাথে দিনাজপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য ভারতের মেঘালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরববর্তীকালে তিনি ৩য় বেঙ্গলে যোগ দেন। এই অপারেশনের ফলে বাহদুরাবদ সম্পূর্ণভাবে মুক্তি বাহিনীর হাতে চলে আসে। অগ্রগামী দলের নেতৃত্বদানকারী লে. নূরুন্নবী এই ভয়াবহ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> "আমি সুবেদার আলী আকবরের ১২নং প্লাটুনের সাথে অবস্থান নিয়ে পুরো আক্রমণটি পরিচালনা করে যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাহাদুরাবাদঘাট আমাদের দখলে চলে আসে। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় পুরো বাহাদুরাবাদঘাট। পাকবাহিনীর প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতাই থাকলো না। .. .. .. বাহাদুরাবাদঘাটটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। যে কারণে উত্তররঙ্গের সাথে এই ঘাট হয়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে পাকবাহিনী ব্যর্থ হয়।"

© www.mukto-mona.com

৩য় বেঙ্গলের দলটি বেসে প্রত্যাবর্তন না করে শাফায়াত জামিলের নেতত্বে, দেশের অভ্যন্তরে অনির্ধারিত দু'একটি অপারেশন চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যে তারা দেওয়ানগঞ্জের রেল স্টেশন ও চিনিরকল সংলগ্ন পাকিস্থানী অবস্থানে হামলা চালিয়ে প্রচুর ক্ষয় সাধন করে সাফল্যের সাথে ফিরে আসে।

জেড ফোর্স সংগঠিত হলে রৌমারীর প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় আসে। মেজর শাফায়াত জামিলের পরামর্শে জিয়া রৌমরীকে মুক্ত রাখার জন্য সকল সামরিক পদক্ষেপ নেবার জন্য শাফায়াত জামিলকে নির্দেশ দেন। ৩য় বেঙ্গলের ওপরই সার্বিক দায়িত্ব বর্তায়। এতদিন রৌমারীর প্রতিরক্ষা মূলতঃ ছেড়ে দেয়া হয়েছিল স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহীদের হতে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রৌমারী রক্ষার দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের বিশেষতঃ জেড ফোর্স কমাণ্ডের ওপর। জিয়া বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। শাফায়াত জামিল মেজর জিয়ার আনুমতি নিয়ে ৩য় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানীকে রৌমরীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। কোম্পানী কমাণ্ডার লে: নূরুন্নবী খানকে তার কোম্পানীকে তাৎক্ষণিক রৌমারী যাত্রার নির্দেশ দেন, এবং রৌমারীর চারিদিকে দ্রুত সার্বিক ও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর শাফায়াত জামিল গুরুত্ব আরোপ করেন।

লেফ্টেন্যান্ট এস আই এম নূরুন্নবীর রৌমারী রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ

৬ই আগস্টে লেফ্টেন্যান্ট এস আই এম নূরুন্নবীকে এই দায়িত্বের কথা জানিয়ে দিয়ে সেদিনই তাকে রৌমারী পৌঁছে পাকিস্থানীদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে রৌমারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন ব্যটিলিয়ন কমান্ডার। নির্দেশ অনুযায়ী তার কোম্পানী ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাতের মধ্যে রৌমারী সদর দফতরে উপনীত হন। এর আগে নূরুন্নবী তার সেনা বাহিনী নিয়ে মানকাচরে এসে ঐতিহাসিক মীরজুমলার মাজার জিয়ারত করে মানকাচরের লঞ্চ ঘাট থেকে দুটি লঞ্চযোগে রৌমারীর লঞ্চঘাটে এসে পৌঁছান সসৈন্যে। লঞ্চঘাটে তাদের সংঘ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ যার মধ্যে ননুরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞা ও রৌমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক মাস্টারও ছিলেন, অভ্যর্থনা করে রৌমারী হাইস্কুলে নিয়ে আসা হয়। সৈন্যদের সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়, এবং কাছেই স্থানীয় ডাক বাংলোতে নূরুন্নবীর অপারেশনাল সদর দপ্তর স্থাপন ও থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

রৌমারীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের লক্ষ্যে শাফাত জামিল মানকাচরে মীরজুমলার মাজার এলাকায় টিলার ওপরে রিয়ার হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাতে দ্রুত প্রয়োজনয়ীয় সেনা, রসদ ও গোলা-বারুদ লৌমারীতে পাঠানো যায়। লঞ্চ ঘাটে বিদায় জানাতে এসেছিলেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডর মেজর জামিল স্বয়ং এবং বিদায় মুহুর্তে তিনি ডেল্টা কোম্পানীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে যে বিদায় বাণী দিয়েছিলেন তা নানা দিক দিয়ে অবিস্মরণীয় :

> "আপনারা আজ এক অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে রৌমারী যাচ্ছেন। জেড ফোর্সের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান একাজে আপনাদেরকেই মনোনীত করেছেন। ইতিমধ্যেই আপনারা বাহাদুরবাদ ঘাট এবং দেওয়ানগঞ্জ শহর অপারেশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। আর সে কারণেই হয়তো ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান রৌমারী রক্ষার কাজে তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানীকেই পাঠাবার জন্য আমাকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি রৌমারী থানা সদরটিকে পাক বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত রাখতে আপনারা সক্ষম হবেন। আমি সার্বক্ষণিকভাবেই রৌমারীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। এজন্য এই মীরজুমলার মাজার এলাকাতেই আমার অস্থায়ী সদর দপ্তর আজ থেকেই কার্যক্রম শুরু করব। .. .. সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার কাছে আপনাদের সাফল্য কামনা করছি। জয় বাংলা।"

আর অবেগ আপ্লুত লে. নূরুন্নবী তাঁর সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সেই শুভলগ্নে বলেছিলেন :

> "আমরা এক অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই রৌমারীর উদ্দেশ্যে দুটি লঞ্চে করে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। শত্রু গত ৪ঠা আগস্ট কোদালকাটি নামের একটি চর দখল করে নিয়েছে। যে কোন সময়ে তারা রৌমারী থানা সদর দখল কওে সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করার সংবাদ পাঠিয়েছে। শত্রুকে রৌমারীতে আসতে দেয়া যাবে না। .. .. আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে ব্যাটিলিয়ন কমান্ডার ও ব্রিগেড কমান্ডারের সম্মান রক্ষা করতে পিছপা হবেন না। .. .. আমরা এখন যে স্থানটিতে

© www.mukto-mona.com

দাঁড়িয়ে আছি তা হচ্ছে বংলার নবাব মীরজুমলার সমাধিস্থল। এটি একটি পবিত্র জায়গা। .. .. আমরা আজ মানকার চরের এই স্থান থেকে রৌমারী জয়ের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা একাজে সফল হব। .. .. জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।"

এখানে লঞ্চ দুটির কথা বলা যাক। ২৫শে মার্চের পাক বাহিনী কর্তৃক ঢাকা আক্রমণের খবর রৌমারীতে পৌঁছালে সীমান্ত এলাকায় ইপিআরদের নিয়ন্ত্রণে থাকা তিনটি লঞ্চ ইপিআর বাহিনী সীমান্তের ওপারে মানকার চর নদী বন্দরে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই লঞ্চগুলো মুক্তিবাহিনীর নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। মানকারচর বন্দর থেকে জিঞ্জিরাম নদীর আঁকা বাঁকা পথ ধরে রৌমারী বন্দর সহ মুক্তাঞ্চলের নানা স্থানে যাতায়াত করত। পরে নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার জনাব কাজিউল ইসলাম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলে লঞ্চগুলোর পরিচালনার ভার তাঁর ওপর দেয়া হয়।
৬ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলা লে. নূরুন্নবীর নেতৃত্বে ৩য় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানীর রৌমারীতে উপস্থিত হওয়া ও রৌওমারীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সুবেদার আলতাফের বাহিনীমহ এযাবৎকাল রৌমারীর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত সকল বাহিনীকে জেড ফোর্সের অন্তর্গত ৩য় বেঙ্গল ব্যাটিলিয়নের কমান্ডে চলে আসে। ক্রমে বেসামরিক প্রশাসনও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে।

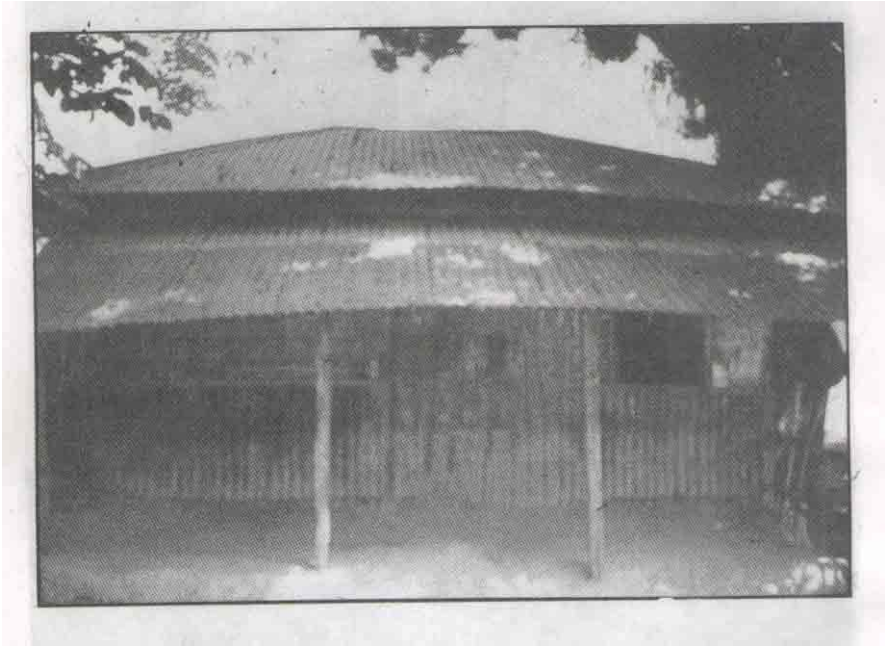

চিত্র ৪ঃ পুরানো ডাকবাংলা – এখানেই স্থাপিত হয়েছিল রৌমারীর সামরিক কার্যালয়

নতুন করে সাজানো হল রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

লে. নূরুন্নবী ছিলেন একজন দক্ষ ও গতিশীল সেনা অফিসার। ইতিমধ্যে রৌমারী মুক্তাঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা রৌমারীর প্রতিরক্ষা হুমকির সম্মুখীন হয়। ঘটনাটি হল ৪ঠা আগস্টের ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে রৌমারীর প্রতিরক্ষার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ চর কোদালকাটি দখল করে নেয়। কোদালকাটির প্রতিরক্ষায় সে সময় নিয়োজিত ছিল হাবিলদার রিয়াজুলের অধীনে ৩০-৩৫ জনের একটি মুক্তিবাহিনীর দল। প্রবল আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে তারা নদী অতিক্রম করে যাদুর চরে এসে অবস্থান নেয়। এই পুরো অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দাত্বি ছিলেন সুবেদার আলতাফ- তিনিই এখানকার প্রতিরক্ষাব্যুহ সাজিয়েছিলেন।

লে. নবী বুঝে ফেলেছিলেন যে বর্তমানে যে প্রতিরক্ষা ব্যক্ষস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট ও অপ্রতিরোধ্য নয় পাকিস্তান বাহিনীর কাছে। তিনি সে রাতেই পাকিস্তানীদের রৌমারীতে ঢুকবার সম্ভাব্য ৭টি পথ চিহ্নিত করলেন। প্রতিটি রুটের সম্ভাব্য

© www.mukto-mona.com

আক্রমণ রুখতে তিনি একজন সেনানীর নেতৃত্বে উপযুক্ত সেনা নিয়োগ করলেন। আর টহল দেবার কাজে সুবেদার আলতাফকে দায়িত্ব দিলেন। সারা রাত ধরে লে. নবী তার প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা সমাপ্ত করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন। তারপর সপ্তাব্যপী এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় রদবদল করেছিলেন। জিঞ্জিরাম নদীর পথ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল মানকার চরে অবস্থিত ব্যটিলিয়ন কমান্ড। এ সময়ের কথা ব্যটিলিয়ন কমান্ডার শাফায়াত জামিল এভাবে স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন ঃ

> "২৫শে মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরই ইপিআর-এর চালকরা লঞ্চ দুটো নিয়ে মানকার চরে অবস্থান নেয়। মোগল সেনাপতি মীর জুমলার মাজার সংলগ্ন নদীর ঘাটে লঞ্চ দুটো ভেড়ানো থাকতো। লঞ্চে কওে প্রায় প্রতিদিনই রৌমারী এলাকা পরিদর্শনে যেতাম আমি। মাতৃভূমিতে অবস্থান করার উদগ্র বাসনায় মেজর জিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গী হতেন।"

লে. নবী কর্তৃক প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় হলে এ সময় ক্যাপ্টেন আনোয়ার শাফায়াত জামিলের নির্দেশে রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হন। ছালিয়াপড়া ও কোদালকাটি অঞ্চলে তাঁরা উভয়ে পাক সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু পাক সেনারা বিপুল ক্ষয় ক্ষতির মধ্যদিয়ে প্রতিবারই পালিয়ে যায়। রৌমারীর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিনষ্ট করা পাকিস্থানীদেও পক্ষে কখনই সম্ভব হয় নি। রৌমারী রণাঙ্গনের বিস্তৃতি ছিল বিশাল এলাকা জুরে – ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপাওে রাজার হাট, কুড়িগ্রাম, উলিপুর, চিলমারী থেকে পূর্বপারে বাহাদুরাবাদ, এবং দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ ও শেরপুরের উত্তর অঞ্চল। এই বিশাল এলাকার পরিমাণ ৬০০ বর্গমাইলের মত এর মধ্যে কার্যকর মুক্তাঞ্চল ছিল সাড়ে চারশো বর্গমাইল। ভারত সীমান্তের ওপারে মানকার চর, মহেন্দ্রগঞ্জ ও তেলঢালিয়া অন্তর্ভুক্ত করলে রৌমারী রণাঙ্গনের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। এই বিশাল মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষা ৩য় বেঙ্গলের দুটি কোম্পানী ছাড়াও তিনটি এফ এফ কোম্পানীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে রৌমারীর সার্বিক প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গলেরও দুটি কোম্পানী। জেড ফোর্সের অধিনায়ক ছাড়াও অন্যান্য ব্যাটিলিয়নের কমাণ্ডাররাও মাঝেমধ্যে রৌমারী মুক্তাঞ্চল ঘুরে গেছেন। রৌমারীতে নিয়োজিত এই বাহিনী সারা ৯ মাস ব্যাপী পাক আক্রমণকারীদের সাফল্যের সাথে প্রতিহত করে এবং এই বিশাল মুক্তাঞ্চলে বাংলাশের পতাকাকে সমুন্নত রাখে।

বেসামরিক প্রশাসন ও নগর কমিটি গঠন

রৌমারীতে বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতদিন সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ এদিকটি বেসরকারীভাবে দেখাশওনা করতেন, আর সামরিক বিষয়গুলো দেখতেন মুক্তিবাহিনীর কমান্ডাররা। নতুন পরিস্থিতিতে সিভিল প্রশাসনকে বাংলাদেশ সরকারের আওতায় আনা হয়। এজন্য একটি নগর কমিটি গঠিত হয়- যারা বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে স্থানীয়ভারে প্রশাসন পরিচালনা করবেন। ৮ই আগস্ট সন্ধায় লে. নবীর উপস্থিতিতে ডাকবাংলো কার্যলয়ে শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনায় এনে সর্বস্তরে বেসামরিক প্রশাসন চালুর সিদ্ধান্তে সবাই একমত হন। এই লক্ষ্যে ঐ সভায় রৌমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুল হক মাস্টারকে সভাপতি করে একটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির গঠন ছিল নিম্নরূপঃ

১। জনাব আজিজুল হক (প্রধান শিক্ষক, রৌমারী হাইস্কুল) – সভাপতি
২। জনাব নূরুল ইসলাম সরকার (সাধারণ সম্পাদক, রৌমারী থানা আওয়ামী লীগ)- সহ সভাপতি
৩। জনাব নওশের আলী আকন্দ (স্থানীয় বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী) – সাধারণ সম্পাদক
৪। জনাব কাজিউল ইসলাম (চীফ পেটি অফিসার) – সহ সাধারণ সম্পাদক
৫। আবদুল করিম (সার্কেল অফিসার, উন্নয়ন, রৌমারী থানা) – সদস্য
৬। মাজাহারুল ইসলাম (নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড) – সদস্য
৭। ম্যাজিস্ট্রেট এম. এ. লতিফ – সদস্য
৮। অঅকতার হোসেন (ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) - সদস্য
৯। আবু হাফিজ (স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক) - সদস্য
১০। আবুল কাশেম চান্দ (ছাত্র, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) - সদস্য
১১। অফিসার ইন চার্জ, রৌমারী থানা - সদস্য

© www.mukto-mona.com

১২। পোস্ট মাস্টার, রৌমারী পোস্ট অফিস - সদস্য
১৩। মেজবাউদ্দীন খান (কাস্টম অফিসার, রৌমারী কাস্টম অফিস) - সদস্য
১৪। আহমেদ হোসেন মোল্লা (প্রধান শিক্ষক, রৌমারী সরকারী প্রাথমিক স্কুল) – সদস্য
১৫। ডাক্তার জহির (রৌমারী থানা হাসপাতাল) - সদস্য

এই কমিটি গঠনের ফলে বেসরকারী প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু হয়– হাসপাতাল, ডাকবিভাগ, কাস্টমস, বিচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হল। কর্মচারীদের বেতন ভাতা, সৈন্যদের জন্য রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা গৃহীত হল। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও গুপ্তচরবৃত্তি রোধ এবং যে সব নাগরিক ভয়ে ঘরবাড়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজও নগর কমিটি গ্রহণ করেছিল। ভারতের মেঘালয়ের সাথে রৌমারী হয়ে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য যাতে চলতে থাকে সে ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল। তবে পূর্ব গঠিত সগ্রাম কমিটিও পাশাপাশি কাজ চালিয়ে গেছে মুক্তি যুদ্ধের সংগঠক ও সহায়ক শক্তি হিসেবে। নগর কমিটির সাথে সংগ্রাম কমিটির খুব একটা বিরোধ ছিল বলে জানা যায় নি।

নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ও প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুল হকের সম্পদনায় প্রকাশ করা হয় সাপ্তাহিক 'অগ্রদূত' যেখানে মুক্তিযুদ্ধের খবর সহ নানা প্রাসঙ্গিক কিষয় স্থান পেত। হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইলে ছাপানো কাগজটি স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। এর সকল কৃতিত্বই সম্পাদকের।

পরবর্তীকালে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট 'রৌমারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সংসদ' গঠন করা হয় যার সভাপতি নির্বচিত হন স্থানীয় এম. এন. এ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিঞা এক্ষং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব আবদুস শহীদ চৌধুরী। এই কমিটি গঠনের লক্ষ্য ছিল রৌমারী মুক্তাঞ্চলে অবস্থিত সকল ইউনিয়নসমূহের উন্নয়ন কার্য কো-অর্ডিনেট করা। এছাড়া জনপ্রিয় ব্যক্তিদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌর কমিটি ও বাজার কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। সাব জোনাল এডমিনিস্ট্রেটর এসব কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিলেন। নগর কমিটির উদ্যোগে অক্টোবর মাসে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো চালু হয়, জমি বেচাকেনার রেজিস্ট্রির কাজও শুরু হয় এ সময় জোনাল এডমিনিস্ট্রেটরের নির্দেশে।

রৌমারী ক্যান্টমেন্ট স্থাপন ও সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুলের কার্যক্রম

১৩ই আগস্ট ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের সেনানিবাস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। রৌমারী হাই স্কুলের শ্রেনী কক্ষগুলোকেই সেনাদের আবাস স্থল হিসেবে চিহ্নিত হল। ঐ দিনই ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ব্যাচের সামরিক ট্রেনিং শুরুর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল মুক্তাঞ্চলে প্রথম প্রকাশ্য সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুল। এর আগেই রৌমারী হাই স্কুলের পেছনে খোলা মাঠে নির্মাণ করা হয়েছিল চাঁদমারী। ক্রমেই এটি একটি সুদক্ষ ট্রেনিং স্কুলে পরিণত হয়েছিল। একটি হিসেবে দেখা গেছে এই সামরিক স্কুল থেকে ১৮-২০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

২৭শে আগস্ট জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়া তেলঢালা ক্যাম্প থেকে রৌমারীতে উপনীত হন। সামরিক ও বেসামরিক সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। রৌমারীর প্রতিরক্ষার সাথে জড়িত লে. নবী সহ সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক নেতাদের আলোচনার মাঝে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্বোধন করতে চাইলে নগর কমিটি পরদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। পরদিন সকাল আটটায় জিয়াউর রহমান পোস্ট অফিসের কার্যক্রম উদ্বোধনের মাধ্যমে রৌমারীতে বেসামরিক প্রশাসনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলেন। হাজার হাজার জনতা সেদিন উপস্থিত ছিল। তারপর এক এক করে মেজর জিয়া থানা সদও, হাসপাতাল, স্কুল, আদালত ও অন্যান্য অফিসের উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানাদি শেষে থানার সামনে আয়োজিত জন সভায় মেজর জিয়া জনতার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেনস এই বলে যে রৌমারীর প্রতিটি নারী পুরুষ আমাদেও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনগণ জয় বাংলা, জয় জিয়া ও জয় মুক্তিবাহিনী শ্লোগানের মাধ্যমে জিয়াকে অভিন্দন জানিয়েছিল। জিয়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম পাপ্পু মিঞা জনতার উদ্দেশ্যে সকলকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সহযোগিতার আহ্বান জানান। লঞ্চে ওঠার আগে জিয়া নূরুন্নবী খানকে জড়িয়ে ধরে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ

© www.mukto-mona.com

Nabi, you have done a graet thing. Nation will have to remember what all you have done here at Rowmari. It will be a milestone in the history of our Liberation war.

রৌমারীতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগমন

বিভিন্ন সময়ে সামরিক ও বেসামরিক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ রৌমারীতে তাদের পদধুলিতে ধন্য করেছেন রৌমারীর মাটিকে। ১১ই আগস্ট হঠাৎ করেই মিত্র বাহিনীর জেনারেল গুরবক্স সিং গিলকে সাথে নিয়ে ব্রিগেড কমাণ্ডার জিয়াউর রহমান রৌমারী মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে আসেন। জেনারেল গিল ক্যান্টমেন্ট পরিচালনা ও সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সবাইর প্রশংসা করলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়োছলেন সামরিক ব্যাপারে যতদূর সম্ভব ভারতীয় সহায়তা দেবার। এ সময় সামরিক প্রশিক্ষণ স্কুলের প্রাঙ্গনে সমবেত হওয়া প্রশিক্ষণরত হাজার হাজার হবু মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা', জয় মুক্তবাহিনী ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। চমৎকৃত ভারতীয় জেনারেল পুনরায় তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এর কিছুদিন পরে আবারও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল গিল সস্ত্রীক রৌমারীতে পদার্পন করে যুদ্ধকৌশল ও সহায়তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বাংলাদেশের সমর নেতাদেও সাথে। একদিন পরেই পুনরায় এসছিলেন মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন অলি আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে ২১শে আগস্ট। জিয়া রৌমারীর বেসামরিক প্রশাসনের কার্যক্রম ও সুষ্ঠূ পরিচালনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে অভিলাস জানিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম উদ্বোধন করার পরবর্তী কোন এক দিন, যর কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে এম.পি ও এম.এন.এ রা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রৌমারী পরিদর্শনে এসেছিলেন।

২২শে আগস্টে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর রৌমারী আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সামরেক অফিসারবৃন্দ মন্ত্রী মহোদয়কে লঞ্চঘাটে সাদর সম্বর্ধনা জানান। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ধন্যবাদ জানালেন সামরিক ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দকে, ধন্যবাদ জানালেন রৌমারী সাধারণ মানুষকে তাদের অসামান্য সাহস ও বীরত্বের জন্য। প্রতিশ্রুতি দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ অস্ত্র ইত্যদি সাহায্য করার, নির্দেশ দিলেন স্থানীয় প্রশাসনকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ পালনের এবং সকল সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি। মন্ত্রী মহোদয় কথা দিলেন যে শিগ্গীরই মুজিব নগর সরকারের একটি 'সাব জোনাল এডমিনিস্ট্রেশন অফিস' রৌমারীতে খুলবেন যার সদর দপ্তর স্থাপিত হবে রৌমারী থানা সদরে। মন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছিলেন – মুজিবনগরে ফিরে গিয়েই রৌমারী চিলমারী ও উলিপুর সমন্বয়ে গঠিত সাব-জোনাল এডমিনিস্ট্রেশন অফিস খোলার নির্দেশ আসে এবং মেজিস্ট্রেট আবদুল লতিফকে সাব-জোনাল এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্তির আদেশ এসে পৌঁছায় মুজিবনগর থেকে। এ ভাবেই মুজিবনগর সরকারের সাথে রৌমারীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এর কিছুদিন পরেই বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রৌমারী মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে এসেছিলেন। নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর বিকেলের দিকে টাঙ্গাইল খ্যাত অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধ কাদের সিদ্দিকী ও তার কয়েকজন সাথী মনকার চর থেকে রৌমারীতে এসে লে. নূরুন্নবী ও মেজর শাফায়াত জামিলের সাথে মিলিত হন। তুরায় ভারতীয় সেনা দপ্তর থেকে সিদ্দিকীর আসার কথা পুর্বেই জানানো হয়েছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান তখন মেঘালয়ে ভারতীয় সামরিক দপ্তরের আতিথেয়তায় আগস্টের মাঝমাঝিতে পাক বাজিনীর সাথে একটি যুদ্ধে আহত হয়ে চিকিৎসারত ছিলেন। সাময়িযক ভাবে তার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধদেরও মেঘালয়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষন ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিদ্দিকীর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, কি ভাবে প্রায় একক চেষ্টায় একটি বিশাল মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলা ইত্যাদি এবং কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে রৌমারী মুক্তাঞ্চলের মধ্যদিয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট হয়ে কিভাবে সহযোগিতা গড়ে তোলা যায় এ নিয়ে লে. নবী ও মেজর শাফায়াত জামিলের সাথে মত বিনিময় হয়। সিদ্দিকী ২-১দিন থেকে অগ্রবর্তী ঘাটিগুলো পরিদর্শন করে রৌমারীর যুদ্ধব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরদিন এন. সি. বি. টেলিভিশন তার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধে অপারেশনরত কিছূ চিত্র গ্রহণ করে।

© www.mukto-mona.com

এর পরপরই ২৮শে সেপ্টেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান রৌমারী মুক্তাঞ্চল সফরে আসেন এবং বেসামরিক প্রশাসনের ব্যবস্থা সরজমিনে দেখেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। মুজিবনগর প্রশাসনের সাথে স্থানীয় প্রশাসনকে যুক্ত করার নির্দেশ দান করেছিলেন। পরদিন সারা মুক্তাঞ্চল ঘুরে ফিরে দেখে রৌমারীর মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা দেখে উচ্ছসিত হন। নাগরিকদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় রৌমারীর জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ৫ই অক্টোবরে রৌমারী রণাঙ্গন পরিদর্শনে আসেন মুক্তিবাহিনীর সর্বধিনায়ক কর্নেল ওসমানি। সাথে ছিলেন ব্রিগেড কমান্ডার জিয়াউর রহমান, মেজর শাফায়াত জামিল, ১১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহেরসহ বেশ কিছু সেনানায়ক। রৌমারীর সমরকৌশল ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর তিনি নাগরিক কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল যে সকলের সর্বাত্মক চেষ্টায় অনেক প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে, একটি কার্যকর বিশাল সুসংহত মুক্তিবাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের মুক্তিবাহিনীর বিশেষত্ব হল এটি দুটি ভাগে বিভক্ত – নিয়মিত সেনাবাহিনী ও গুবাহিনী, দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধকে তিনি সাতকোটি বাঙালীর গণযুদ্ধ নামে অভিহিত করেন। সেদিনই তিনি তেলঢালিয়া জেড ফোর্সের প্রধান দপ্তরে জিয়ার সাথে ফিরে যান। হাজার হাজার মানুষ সেদিন সর্বাধিনায়ককে লঞ্চঘাটে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। এর পরদিনই তিনি আদেশ দেন জেড ফোর্সকে সিলেটে ৫নং সেক্টরে চলে যেতে - সেখানে মীর শওকাত আলীর বাহিনীর সাথে মিলিত হতে। রৌমারীর সকল দায়িত্ব অর্পন করা হয় মেজর তাহেরের নেতৃত্বাধীন ১১নং সেক্টরের হাতে। কর্নেল ওসমানির পরিদর্শনের দিন কয়েক পরেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোশতাক আহমেদ রৌমারীতে এসেছিলেন সফর সঙ্গী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ও মাহবুব আলম চাষীকে নিয়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে পচাত্তরের ১৫ই আগস্টের নারকীয় ঘটনার সাথে এই ত্রয়ীর সম্পৃক্ততা দেশবাসী জানে। এখানে এসেও খোন্দকার মোস্তাক তার চরিত্রকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। রৌমারীতে পৌছেই পাকিস্থানের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত জনৈক মওলানা আব্দুর রাজ্জাককে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার অন্যায় আদেশ দেন, যা নগরিক কমিটির সদস্যদের বিস্মিত করেছিল। উল্লেখ্য যে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ ও তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রৌমারী আদালত উক্ত অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল।

এন. সি. বি. দূরদর্শন দলের রৌমারী মুক্তাঞ্চলের চিত্রনির্মাণ

৮-১০ই সেপ্টেম্বরে তিন দিন ব্যাপী আমেরিকা ভিত্তিক এন. সি. বি নামের টেলিভিশন দলের রৌমারী মুক্তাঞ্চলের, মুক্তিযুদ্ধের, রৌমারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অগ্রবর্তী ঘাটিসমুহে মুক্তিবাহিনীদের অবস্থান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ স্কুলটির কার্যক্রম ও ট্রেনিংরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দক্ষতা, রৌমারীর বেসামরিক প্রশাসন কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন এবং পরিশেষে ৯ই সেপ্টেম্বর পাকবাহিনীর শক্ত অবস্থান কোদালকাটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর সেনাদের সত্যিকার দু-তিন ঘন্টা ব্যাপী সম্মুখ যুদ্ধের সফল চিত্রায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে। সে সময় কাদের সিদ্দিকী জেড ফোর্সের ১ম বেঙ্গলের কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দীন, ৩য় বেঙ্গলের কমান্ডার মেজর শাফায়াত জামিল ছাড়াও ব্রিগেড অধিনায়ক মেজর জিয়উর রহমান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পরদিন টিভি টিম সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা দিন গোটা এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী ঘাটিগুলো এবং এদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার চিত্রায়ন হল, ২০ সদস্যের কাদেরিয়া বাহিনীর দল কিভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে, কিভাবে জল কাদা ভেঙে শত্রুপক্ষের ঘাটিতে রেইড করে, এ্যম্বুশ করে এই গেরিলা দল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রদর্শন করল– যা টিভি দলটি অনুপুঙ্খভাবে চিত্রায়িত করেছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর ছিল সত্যিকার ভয়ানক যুদ্ধের চিত্রায়র যা কিনা মহরা নয়। আসল ঘটনা। টিভি দলের নেতা ক্যাপ্টন রজার্সের অনুরোধে লে. নূরুন্নবী দলটিকে কোদালকটি প্রতিরক্ষাব্যুহের অগ্রবর্তী বেসে নিয়ে যান, সেখানে দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার। এখান থেকে কেদালকটির দূরত্ব মাত্র ৩৫০-৪০০ ফুট। রজার্সের অনুরোধ ছিল "ক্যাপ্টেন নবী, আমরা পাকিস্থান আর্মির সাথে তোমাদের প্রকৃত লড়াইয়ের চিত্র তুলতে চাই।" রজার্সের অনুরোধে, সকল প্রস্তুতি নিয়ে বিদেশীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও, লে. নবীর নির্দেশে ও পরিচালনায় মুক্তিবাহিনী কোদালকাটিতে ৩-৪টি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে আক্রমণ চালায়, আর মুহুর্তে সারা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হল। দুতিন ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ চলে, পরে মুক্তি বাহিনী তাদের নিরাপদ অবস্থানে ফিরে আসে। মুক্তিবাহিনীর সাথে থেকে সমগ্র যুদ্ধকাণ্ডের জীবন্ত চিত্র টিভি দলটি চিত্রায়িত করে।

শোনা যায় সিনেটর কেনেডি উদ্যোগী হয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে অভিজ্ঞ সাংবাদিক ক্যাপ্টেন রজার্সের নেতৃত্বে এই টিভি দলটিকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সচিত্র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুটি প্রামান্য চিত্র সারা বিশ্বে প্রদর্শন করে- যা বিশ্ব জনমত আমাদের পক্ষে আনতে কিছুটা ভূমিকা রাখে। এই টিভি চলচ্চিচত্র দুটির শিরোনাম ছিল ঃ

© www.mukto-mona.com

‘A country made for disaster’ এবং ‘ Date line Bangladesh’। এই টিভি দলটি ব্রিগেড অধিনায়ক মেজর জিয়া, ব্যাটিলিয়ন কমান্ডার মেজর শাফায়াত জামিল ও টাঙ্গাইল মুক্তিবাহীনীর নায়ক কাদের সিদ্দিকী- মুক্তিযুদ্ধের এই তিন নায়কের সাক্ষাৎকারর চিত্রায়ন করে। বিদায় কালে ক্যাপ্টেন রজার্স লে. নূরুন্নবীকে সোৎসাহে বলেছিলেন ঃ

> ‘Captain Nabi, no one can stop your independence. We will try our best to know the whole world how youe soldiers are fighting for independence. We believe that the sympathy of the whole world will be in your favour. .. .. This is an wonderful experience. I have never faced this kind of situation. Your soldiers are really fighting strong enemies staying face to face. .. .. ’

তিন রাত কাটিয়ে রজার্সের দল ১১ সেপ্টেম্বর সকালে লঞ্চযোগে মনকারচর হয়ে ভারতে চলে যায়। এ তিনটি রাত তাঁরা রৌমারীতে লঞ্চঘাটে ভেরা লঞ্চেই রাত কাটিয়েছিলেন।

রৌমারী প্রতিরক্ষার আক্রমণাত্মক ভূমিকা

এখানে উল্লেখ্য যে রৌমারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতু কেবল রক্ষণাত্মক ছিল না। রক্ষনাত্মক ব্যবস্থা সুসংহত হলে লে. নূরুন্নবী রৌমারীর প্রতিরক্ষার হুমকি স্বরূপ কোদালকাটিতে ও চিলমারী-উলিপুরে পাক সেনাদের শক্ত ঘাটিসমুহ ধ্বংসের লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক ভূমিকাও নিয়েছিল। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগস্টের শেষের দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পশিচমপারে দেশের অভ্যন্তরে চিলমারী, উলিপুর ও কুড়িগ্রাম এলাকায় একটি সম্মিলিত ও সুসংযোজিত আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উদ্ধেশ্য (১) কুড়িগ্রাম-উলিপুর রেলপথের মামাঝিতে দূর্গাপুর রেলসেতু ধ্বংস করা; (২) উলিপুরে ডাকবাংলো ও রাজাকার মুকুল কমান্ডারের বাড়ীতে অবস্থানরত পা সেনাদের ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে পর্যদুস্ত করা; (৩) এবং উলিপুর ও চিলমারীর মধ্যে সংযোগকারী রেলপথে ওপর মালতীবাড়ী, ফুলতলা ও সাদুল্লাপুর তিনটি রেলসেতুকে উড়িয়ে দেয়া। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে ৩১শে আগস্ট প্রত্যুষে যুগপৎভাবে অভিলক্ষ্য বস্তুগুলোর ওপর আক্রমণ চালানো হয় সাফল্যের সাথে। মুক্তিযোদ্ধদের এটি একটি বিশাল সাফল্য- ১০ মাইল নদী নৌকাযোগে অতিক্রম করে ২০-২৫মাইল অভ্যন্তরে সফল অভিযান চালনা ও সাফল্যের সাথে বেসক্যাম্পে ফিরে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। উলিপুর রেইডের দুঃসাহসিক অপারেশনে অংশ নিয়েছিল লে. মোদাসেরের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন, যার একটি অক্রেমণ করে ডাকবাংলো আর অন্যটি অক্রমণ চালায় রাজাকার কমান্ডার মুকুলের দ্বিতল ভবনে। সেতু ধ্বংস সাধনে অংশ নিয়েছিল ৪টি ধ্বংসকারী দল। মোট ১৫০ জনের একটি সুসংহিত মুক্তিবাহিনীর দল এই ৫টি অপারেশনে অংশ নেয়।

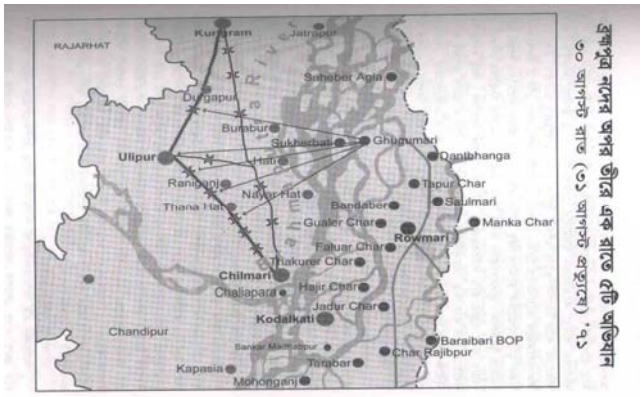

চিত্র ৫ঃ চিলমারী-উলিপুর রেইড পরিকল্পনা

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল কোদালকাটি অবরোধ। আমরা আগেই বলেছি আগস্টের প্রথমদিকে কোদালকাটি পাকিস্থানীদের কাছে হাতছারা হয়ে গেলে রৌমারীর প্রতিরক্ষা নাজুক হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় লে. নূরুন্নবী জেড ফোর্সের পক্ষ থেকে রৌমারী

© www.mukto-mona.com

রণাঙ্গনের দায়িত্ব নেন, এবং অনতিবিলম্বে পাকিস্থানীদের আক্রমণের সম্ভাব্য সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে একটি সুসংহত প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে ফেলেন। কোদালকাটি থেকে যাতে পাক সৈন্যরা বের হয়ে মূল রৌমারীর দিকে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য এর চারপাশে বিভিন্ন চরে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সুদৃঢ় অবস্থান নেয়। ফলে পাক সেনারা কোদালকাটি থেকে বার আক্রমণ চালানোর চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হয় – সারা আগস্ট ধরে এই ধারা অব্যাহত থাকে। এর পর আগস্টের শেষ দিক থেকে শুরু হয় কোদালকাটির ওপর মুক্তিবাহিনীর প্রতি আক্রমণ। স্থির হয় সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে কোদালকটির মত বিষ ফোঁরাটিকে অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষিতে স্থির হয় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সময় এসে গেছে। সিদ্ধান্ত হয় যে সুবেদার আলতাফের পরিচালনায় এম. এফ কোম্পানী দ্রুত নদী অতিক্রম করে শঙ্কর-মাধবপুর গ্রামে গিয়ে পাক অবস্থানকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলবে, প্রয়োজনীয় পশ্চাদপদ সহায়তা ও অপসারণ সহায়তা দেবার দায়িত্ব পড়েছিল ১ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী এবং হাজীর চরের করম আলীর বাহিনীর ওপর। এছাড়া প্রয়োজনে ফায়ার সাপোর্ট দেবে ঠাকুর চরে অবস্থান নেয়া আলী আকবরের কোম্পানী। এছাড়া এক কোম্পানীর চেয়ে বেশী একটি মুক্তিবাহিনীর দল প্রস্তুত থাকবে হাজির চর ও ঠাকুরের চরে উপস্থিত হতে। ১লা অকোটবরে শুরু হয়ে যায় মুক্তি বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ তিনদিক থেকে। শুরু হয় মুখোমুখী ভয়ানক আক্রমণ প্রতি আক্রমণ সারাদিন ধরে ২রা অক্টোবর বিকেল পর্যন্ত। যুগপৎ অপারেশনের চাপে পাক সেনারা টিকতে পারবে না অনুমান করে তারা দ্রুত পশ্চাদ অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে চিলমারীর দিকে লঞ্চ যোগে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালিয়ে যাঁযার আগে তাদের হতাহতদের উদ্ধারের জন্য শঙ্কর-মাধবপুরের গ্রামবাসীদের বাধ্য করে। কাজ শেষে পাকিস্থানীদেও চরিত্র অনুযায়ী ৬৫টি জন নিরীহ গ্রামবাসীকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। একে শীতল রক্তে গণহত্যা ছাড়া অন্য কি নামে অভিহিত করা যায় ? শোনা যায় এদের একজন প্রভাবশালী ধনী কৃষক ছিলেন যিনি পাক সেনাদের সাথে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক রেখে বসবাস করছিলেন। এভাবেই কোদালকাটি শত্রুমুক্ত হয় ২রা অক্টোবরে। দিনটি একদিকে যেমন আনন্দের তেমনি বিষাদেরও, রৌমারী হারালো ৬৫টি জন প্রিয়জনকে। তবে সংখ্যটি সঠিক কিনা জানি না, কোন সূত্রে বলা হয়েছে শহীদের সংখ্যা ৫৭ জন, এর মধ্যে ৫৩ জনের নাম পরিশিষ্ট : ১'এ দেওয়া হল। এখানে উল্লেখ্য যে ক'জন সাধারণ নারী আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাঁর মধ্যে বীর প্রতীক তারামন বিবি কোদালকাটি অবরোধ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

শেষ কথা

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর হাইকমান্ডের আদেশে ৬-১০ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে ৩য় বেঙ্গলসহ জেড ফোর্স সিলেটে চলে গেলে, রৌমারীর রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষাসহ সকল সামরিক দায়িত্ব প্রদান করা হয় ১১নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর আবু তাহেরের ওপর। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে বৃহত্তর মৈমনসিংহ ও ব্রহ্মপুত্রের বুকে গড়ে ওঠা অসংখ্য চর এলাকা সহ বৃহত্তর রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার বেশ কিছু এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল ১১নং সেক্টর। ফলে রৌমারীর ৬০০ বর্গমাইল মুক্তাঞ্চল। অন্তর্ভুক্ত হল ১১নং সেক্টরে। আগে থেকে লে. নূরুন্নবীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে ও মেজর শাফায়াতের সার্বিক তত্বাবধানে গৃহীত রৌমরীর কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক রেখে মেজর তাহের আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে থাকেন– ব্রহ্মপুত্রের অপরাপারে মুক্তিযোদ্ধদের গোপন অবস্থান বাড়িয়ে তোলা, রৌমারীর নাকের কাছে চর রাজীপুর সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর পাকিস্থানীদের শক্ত ঘাটি কোদালকাটি শত্রুমুক্ত করা, বিখ্যত চিলমারীবন্দর অভিযান, কামালপুর অভিযান ইত্যাদি তার এই মনোভাবেরাই প্রকাশ। ৮ই নভেম্বরের মধ্যেই জামালপুর শেরপুর সহ মৈমনসিংহের উত্তরাঞ্চল, পাবনা-সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম গাইবান্ধর বিশাল অংশ ১১নং সেক্টর বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তাহেরের সাথে যে কজন অফিসার ছিলেন তার মধ্যে স্কোয়াড্রন লিডার মোঃ হামিদুল্লাহ, ক্যাপ্টেন আবদুল আজিজ, লে. তাহের আহমেদ, লে. আসাদুজ্জামান প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য যে কামালপুর অভিযানকালে মেজর তাহের গুরতর আহত হয়ে তাঁর একটি পা হারিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকার এই সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে বীরোত্তম উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে– আর ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর পরবর্তীকালের নতুন নায়ক জিয়াউর রহমান তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলায়। এতদসত্তেও কামপুরের শক্তঘাটি থেকে পাক বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি মুক্তি বাহিনীর পক্ষে। তবে মুক্তি বাহিনী চারদিক থেকে পাক অবস্থানকে অবরোধ করে রাখে। তাই কামালপুরকে শত্রুমুক্ত করতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দির্ঘদিন; অবশেষে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হলে ৪ঠা ডিসেম্বরে কামালপুরের পাকিস্থানী সেনাদের ১৪০ জন নিয়মিত বাহিনী সহ রেঞ্জার ও রাজাকার বাহিনী মুক্তি বাহনীয় কাছে আত্মসমর্পন করে – আর এর জন্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। কামালপুর অভিযানে বিভিন্ন সময়ে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ সহ অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়েছে। এই যুদ্ধে অসম সাহসিক অবদান রাখার জন্য বীর উত্তম থেকে বীর প্রতীক স্তরের খেতাব বিভিন্ন মর্যাদার ২৯ জন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদান করা হয়।

© www.mukto-mona.com

চিত্র ৬ঃ কামালপুর স্মৃতি সৌধ - ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ সহ অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে সৌধটি নির্মিত হয় ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ।

রৌমারী মুক্তাঞ্চলের দায়িত্ব নেয়ার পর ১১নং সেক্টরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চিলমারী অভিযান- যা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী । সেক্টর অধিনায়ক মেজর তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধদের কয়েকটি দল বিভিন্ন দিক থেকে চিলমারীর শক্ত পাকিস্থানী ঘাটিগুলোর ওপর সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে ১২ অক্টোবর থেকে । প্রায় ১০ মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নেদও বুক চিরে রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় । চার পাঁচদিন যুদ্ধের পর অবশেষে চিলমারীর পতন ঘটে ১৬ই অন্টোবর তারিখে । পাকিস্থানীরা অনেক কষ্টে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় অনেক হতাহত স্বীকারকরে । প্রায় দু'শত রাজাকার আত্মসমর্পণ করে, এবং প্রচুর গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয় । রাজাকেরদের দুজন কুখ্যাত নেতা ওয়ালী মোহাম্মদ ও পঞ্চুমিঞাকে রৌমারীর আদালতে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্য়কর করা হয় চাঁদমারী এলাকায় ফায়ারিং স্কোয়ডে প্রকাশ্য গুলি করে । তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নারী নির্যাতন, নিরীহ মানুষ হত্যা, দেশদ্রোহিতা ও লণ্ঠনসহ বিভিন্ন ধরণের অপরাধ । এই ঐতিহাসিক অভিযান আমাদের মুক্তিযুদ্ধে 'চিলমারী রেইড' নামে চিহ্নিত হয়েছে । এই অভিয়ানে রৌমারী ও তৎসংলগ্ন এলাকার বেশ ক'জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন যার মধ্যে আমরা মুক্তমনারা যে স্কুলটিকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি সেই খেদাইমারী এলাকার দু'জন ছাত্রও এই যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য । আমরা এই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা পরিশিষ্টে যুক্ত করলাম ।

সার কথা হল মুক্তিযুদ্ধের ৯মাস কালে রৌমরী মুক্তাঞ্চল সব সময় আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে– এটি এমন একটি অঞ্চল ছিল যেখানে রাজাকার, জামাত ই ইসলাম আর শান্তি কমিটির কোন দৌরাত্ম ছিল না, জন জীবন ছিল শান্ত ও স্বাভাবিক কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃপ্ত । কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মের ক'জন মানুষ জানে রৌমারীর সাধারণ মানুষের এই বীরগাথা ?

<u>সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জী</u>

১ । এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ৭ই জুলাই, ১৯৯১ - লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী
২ । রৌমারী রাজীবপুরের অআর্থ সামাজিক বিবর্তন, ১৯৯৫ – আজিজুর রহমান
৩ । রৌমারী রণাঙ্গন, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, নতুন সংস্করণ ২০০৪ – লে. কর্নেল এস আই এম নূরন্নবী খান বীর বিক্রম
৪ । একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রের নভেম্বব, ১৯৯৮ – কর্নেল (অব) শাফায়াত জামিল

© www.mukto-mona.com

৫। স্বাধীনতা' ৭১ (দুটি পর্ব), ১৯৮৫ – কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম
৬। লোক সাহিত্যে লৌমারী, ১৯৮৮ – সমর পাল

পরিশিষ্ট ১ ঃ শঙ্কর-মাধবপুর গণহত্যা

১৯৭১ এর ২রা অক্টোবর পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছিলেন শঙ্কর-মাধবপুর সহ কোদালকাটি ও মোহন গঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভক্ত গ্রামের অনেক নিরীহ মানুষ। এখানে একটি অস্মূর্ণ তালিকা উপস্থিত করা হল। দুটি ইউনিয়নই বর্তমানে রাজিবপুর থানার অন্তর্গত।

ক্রমিক নং	শহীদের নাম	শহীদের পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম
১	আবদুর রহমান	নিজামউদ্দিন	শঙ্কর মাধবপুর [১] (ইউনিয়ন কোদালকাটি)
২	মোকছেদ আলী	মলফু দেওয়ানী	”
৩	মোহাম্মদ আলী	মলফু দেওয়ানী	”
৪	আবদুল শেখ	ঘুতু শেখ	”
৫	রেজিয়া খাতুন	আবদুল মজিদ	”
৬	নয়ান শেখ	করিম শেখ	”
৭	হাজী এন্তাজ আলী	জাবেদ আলী	”
৮	সিদ্দিক মণ্ডল	সেরাজ মণ্ডল	”
৯	খোরশেদ আলী মুন্সী	আছরউদ্দিন মুন্সী	”
১০	আবদুল বারী	মুলুক চান্দ ব্যাপরী	”
১১	কুতুব আলী	ইনসার আলী	”
১২	এনতাজ/মনতাজ ? আলী দেওয়ানী	হোসেন ফকির	”
১৩	বাদশা দেওয়ানী	ছন্দু মুন্সী	”
১৪	আবদুল গনি	সাহেব আলী	”
১৫	আয়নাল হক	আবদুল জব্বার	”
১৬	ফজল হক	আবদুল জব্বার	”
১৭	পাহালী শেখ	আয়েন উদ্দিন গাইরাল	”
১৮	মোকছেদ আলী	আয়েন উদ্দিন গাইরাল	”
১৯	জুরান শিকদার	গোমর শিকদার	”
২০	নূর ইসলাম	আবদুল কাইউম	”
২১	আজিজুর রহমান	আবদুল কাইউম	”
২২	আজিজুল হক	আবদুল কাইউম	”
২৩	আজিবর রহমান	তজু দেওয়ানী	”
২৪	ময়ান শেখ	কছিমুদ্দিন শেখ	”
২৫	হেলাল বেপারী	মকবুল শেখ	”
২৬	নতুব আলী শেখ	হেলার বেপারী	”
২৭	জব্বার আলী	ইহেজ উদ্দিন	”
২৮	মেজাল শেখ	এহিমুদ্দিন	”
২৯	ঘযরত আলী	ওয়াজুদ্দিন	”
৩০	লাল চান্দ	পানা উল্লাহ	”
৩১	এন্তাজ দেওয়ানী	হোসেন আলী ফকির	”

© www.mukto-mona.com

৩২	আবুল হোসেন	তজু দেওয়ান	”
৩৩	অয়েন উদ্দিন	পানা উল্লাহ	সাজাই [২] (ইউনিয়ন কোদালকাটি)
৩৪	কছিম উদ্দিন	আগর (আমির ?)* আলী	”
৩৫	আছমত আলী	সোলতান মুন্সী**	”
৩৬	আবদুল আজিজ	আবদুস সোবহান***	”
৩৭	সোবহান বেপারী	জরিফ বেপারী	”
৩৮	বিষু শেখ	তমেজ উদ্দিন****	”
৩৯	আয়বী বেওয়া	মৃত (স্বামী ?) আজিজ (ম?) উদ্দিন শেখ	তেররশি (ইউনিয়ন কোদালকাটি)
৪০	মফিজ উদ্দিন	আয়েন গাইরাল	শঙ্কর মাধবপুর
৪১	আবদুল আজিজ	মোঃ সোহরাব	সাজাই
৪২	ইনছু শেখ	সোবহান আলী	সাজাই ? (কোদালকাটি)
৪৩	সিদ্দিক আলী	মেছের আলী	কোদালকাটি
৪৪	মজিদ সরকার	বায়েস উদ্দিন	”
৪৫	নহেজ আলী	সাদু মোল্লা	”
৪৬	তোরান মোল্লা	কুতুব মোল্লা*	” (সাজাই ?)
৪৭	আবদুল গফুর	ছোবহান সরকার	”
৪৮	সোহাগী বেওয়া	স্বামী ফজর মোল্লা	” (সাজাই ?)
৪৯	মেরাজ উল্লাহ শেখ**	আসরাব আলী	”
৫০	জামসেদ আলী	জাবেদ মুন্সী	ভেলামারী (ইউনিয়ন মোহন গঞ্জ)
৫১	সাইদুল ইসলাম	আবদুল মজিদ	”
৫২	রোস্তম আলী	তোরাব আলী	”
৫৩	ডালিমন নেসা	মকবুল (মকররম ?) আলী মুন্সী	”
উল্লিখিত নাম ছারাও রাজিবপুর মু যোদ্ধা সংসদ দেয়া তালিকায় অতিরিক্ত কিছ নাম পাওয়া যায় যা নীচে দেয়া হল			
৫৪	রোস্তম ঘোষ [৩]	বাজারী ফকির	শঙ্কর মাধবপুর
৫৫	মাহেজ আলী	খায়ের উদ্দিন	কোদালকাটি
৫৬	জোসন আলী	কোরবান আলী	ভেলামারী
৫৭	কোরবান আলী	ওসমান আলী	”
৫৮	লাল চাঁন মিঞা	রমজান আলী	”
৫৯	ইউসুফ আলী	লাল চাঁন মিঞা	”
৬০	আনছের আলী	জাবেদ মুন্সী	”
৬১	দানেজ আলী সরকার	রমজান আলী	তারাবর (ইউনিয়ন মোহন গঞ্জ)
৬২	আব্দুর রহিম	ইব্রাহীম শেখ	”

* রাজিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায় পিতার নাম লেখা হয়েছে আমির আলী

** রাজিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায় পিতার নাম লেখা হয়েছে আঃ সোবহান

*** রাজিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায় পিতার নাম লেখা হয়েছে জরীপ ব্যাপারী

**** রাজিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায় পিতার নাম লেখা হয়েছে আয়েজউদ্দিন মুন্সী

* রাজিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায় পিতার নাম লেখা হয়েছে খায়ের উদ্দিন

** রাজিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায় এ নামটি লেখা হয়েছে আরজ উল্যা শেখ, পিতা আছরোফ আলী শেখ

© www.mukto-mona.com

৬৩	সমতুল্যহ শেখ	গোমর শেখ	”
৬৪	হছের আলী	ইসমাইল শেখ	”
৬৫	ভাঁজন মিস্ত্রী	আজগর আলী	”
৬৬	জহর শেখ	আয়েনউদ্দিন শেখ	”
৬৭	আব্দুল মতিন	”	”
৬৮	যাদব ফকির	মোকছেদ আলী	”
৬৯	রোস্তম আলী	গোমর শেখ	”
৭০	নাদেম আলী	দানেশ আলী	”
৭১	ইদ্রিস আলী	লিচু শেখ	”
৭২	ছায়েদ আলী	আহম্মদ আলী	”
৭৩	আবদুল জলিল	”	”

১। জানা যায় শঙ্কর মাধবপুর, কোদালকাটি, সাজাই ও ভেলমারী গ্রামে পাকিস্থানীরা পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে মোট ৬৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। কেবল শঙ্কর মাধবপুর গ্রামেরই ৫৭ জন সেদিন শহীদ হয়েছিলেন, এর মধ্যে মাত্র ৩১ জনের নাম পরিচয় পওয়া গেছে।
২। সাজাই গ্রামের বধ্যভূমিতে রয়েছে ৬৫টি জন গ্রামবাসীর গণকবর। এখানে জানা মতে মাত্র ৭ জনের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল যারা ২রা অক্টোবরে পাকিস্থানীরা হত্যা করে।
৩। এই নামটি রাজিবপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক তৈরীকৃত তালিকায় ১৯নং ’ পাওয়া যায়।
৪। এই নামটিও উক্ত তালিকায় ৪০নং নাম।

পরিশিষ্ট ২ঃ রৌমরারীর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের নাম পরিচয়

ক্রমিক নং	শহীদে নাম (গেজেটে নং)	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন/পোস্ট অফিস
১.	আবদুল মজিদ (৩৩৯৮): স্কুল ছাত্র/শিক্ষক ?	মৃত জিন্নত উল্লাহ	টাপুর চর	বন্দবের
২.	আবদুল লতিফ (৩৪১০): ৯ম শ্রেণীর ছাত্র-টাপুরচর হাইস্কুল	মৃত (?) আবেদ আলী	“	“
৩.	আবু আসাডদ (৩৪১১): স্কুলছাত্র	মৃত আলহাজ আবদুর রশীদ	বাইটকামারী	“
৪.	আবুল হোসেন (৩৩৭৪): স্কুল ছাত্র	মৃত আনসার আলী	চর খেদাইমারী	“
৫.	আবদুল বারী (৩৩৭৫): স্কুল ছাত্র	মৃত আসর উদ্দীন	খেদাইমারী	“
৬.	আবদুল হামিদ: সি এন্ড বি কর্মচারী/ ছাত্র ?	মৃত ময়েজ উদ্দীন মণ্ডল	মধ্যের চর (টাপুর চর)/ মধ্য টাপুরচর	“
৭.	খোন্দকার আবদুল আজিজ: পুলিশ	খোন্দকার মোজাফফর হোসেন	রৌমারী	রৌমারী
৮.	বদিউজ্জামান : ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট	আব্বাস আলী	নটান পাড়া	“
৯.	কছিবর রহমান : ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট	মোঃ ওসমান আলী / গনি?	নতুন বন্দর	“
১০	ডসপাহী দরবেশ আলী:	মৃত আবদুল কাইউম	শঙ্কর মাধবপুর	কোদালকটি

© www.mukto-mona.com

	ইপিআর*			

* তিনি ২৫শে মার্চের ভয়ঙ্কর রাতে অথবা ২৬শে মার্চ প্রত্যুষে পাক বাহীনীর হাতে পীলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার আক্রমণ কালে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। এই বীর শহীদের রেকর্ড ঢাকায় বিডিআর সদর দপ্তরে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়।

© www.mukto-mona.com